সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ কীসের জোরে দুর্ধর্ষ ফ্যাসিস্ট জার্মান বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল

স্যোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া

প্রকাশকের কথা

এবছর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পরাজয়ের ৬০ বছর (৮ মে, ২০০৫) পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা আবারও প্রচার চালায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান বাহিনীর পরাজয়ের প্রধান কৃতিত্ব আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের, সোভিয়েট ইউনিয়নের নয়। আরও লক্ষণীয় ছিল খোদ রাশিয়ার ভিতরের চিত্র। একদিকে প্রতিবিপ্লবী পুঁজিবাদী প্রেসিডেন্ট পুটিন এবার বিজয়দিবসের কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার নামে রুশ জনগণের অংশগ্রহণ আটকে দিয়ে, সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের। অন্যদিকে দেখা গেছে, জনগণের হাতে লেনিন-স্ট্যালিনের ছবি, স্ট্যালিনের ছবি লাগানো ট্রেনে চেপে মস্কোর অনুষ্ঠানে আসার প্রবল আগ্রহ। যা প্রমাণ করেছে, ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে স্ট্যালিনবিরোধী কুৎসা রটিয়েও জনগণের হৃদয়ের আসন থেকে মহান স্ট্যালিনকে নামানো যায়নি। কুচকাওয়াজে যে সমস্ত প্রবীণ লালসেনারা অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের বুকে ছিল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতীক কাস্তে-হাতুড়ি-তারার ব্যাজ — যে দৃশ্য পুটিনকে হজম করতে হয়েছে। পুলিশি ব্যারিকেডের বাইরে দাঁড়িয়ে রুশ জনতা বলেছে '৮ মে আমাদের দিন, জনগণের উদ্‌যাপন করার দিন, পুঁজিবাদী শাসক ও সাম্রাজ্যবাদীদের নয়।'

এই পটভূমিতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেই দিনগুলির কথা স্মরণ করার ও করানোর তাগিদ আমরা অনুভব করেছি। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা শুধু দেখাতে চেয়েছি, সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ ঠিক কীসের জোরে দুর্ধর্ষ জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। এ এক অমূল্য ইতিহাস, যা না জানলে সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি ও মহান নেতা স্ট্যালিনের যুগান্তকারী ভূমিকা ও সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধারণা অপূর্ণ থেকে যাবে এবং যা জানলে শোষণমুক্তির লড়াই আরও ধারালো হবে। এই লক্ষ্য থেকেই আমাদের দলের বাংলা মুখপত্র সাপ্তাহিক 'গণদাবী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। পাঠকদের চাহিদা থাকায় সেই লেখাটি, কিছু সংযোজন সহ পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা হল।

১লা অক্টোবর, ২০০৫ **মানিক মুখার্জী**
এস ইউ সি আই অফিস
৪৮ লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩

সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ কীসের জোরে দুর্ধর্ষ ফ্যাসিস্ট জার্মান বাহিনীকে পরাস্ত করেছিল

ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ৬০ বছর পূর্তি দিবস ৮ মে উদ্‌যাপিত হল বিশ্বজুড়ে। ফ্যাসিস্ট জার্মানবাহিনীর সীমাহীন দম্ভ ও বর্বরতার বিরুদ্ধে এই ঐতিহাসিক বিজয়ের কারিগর ছিল সোভিয়েট সমাজতন্ত্র, লালফৌজ ও সোভিয়েট জনগণ এবং তার সেনাপতি মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিনগুলিতে বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতপুষ্ট জার্মানবাহিনী পোল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, হল্যান্ড, ফ্রান্স, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রীস সহ প্রায় সমগ্র ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকায় বৃটিশ সোমালি, কেনিয়া, সুদান, লিবিয়া, মিশর — একের পর এক দেশ দখল করে এবং এই দেশগুলির সমস্ত সম্পদ লুণ্ঠন করে ১৯৪১ সালের ২২ জুন ঝঞ্ঝার গতিতে আক্রমণ হানে সোভিয়েটের উপর। একনাগাড়ে তিন বছর ধরে সোভিয়েট অবরুদ্ধ থেকেছে। যেখানে সমগ্র বিশ্বযুদ্ধে প্রাণ গিয়েছিল প্রায় ৫ কোটি মানুষের, সেখানে শুধু সোভিয়েটই হারিয়েছে তার ২ কোটি ৭০ লক্ষ

মানুষ। গোটা সোভিয়েটে এমন কোনও পরিবার ছিল না যার কেউ না কেউ যুদ্ধে নিহত হয়নি। সেই অবরুদ্ধ অবস্থা থেকেই ঘুরে দাঁড়ায় সোভিয়েট ইউনিয়ন। সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ নিজেদের দেশকেই মুক্ত করেছে শুধু নয়, মানবসভ্যতাকেও রক্ষা করেছে এক ভয়াবহ বর্বরতা ও দাসত্বের কবল থেকে। তারা জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর কব্জা থেকে মুক্ত করেছে রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, গ্রীসের কিছুটা অংশ, পোল্যাণ্ড, জার্মানি, ডেনমার্ক এবং উত্তর নরওয়েকে। এই দেশগুলিকে মুক্ত করা মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। ব্যাপক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রোমানিয়ায় প্রাণ দিয়েছে লালফৌজের ৬৯ হাজারেরও বেশি, পোল্যাণ্ডে ৬০ হাজার, হাঙ্গেরিতে ১ লক্ষ ৪০ হাজারেরও বেশি, অস্ট্রিয়াতে প্রায় ২৫ হাজার এবং জার্মানিতে ১ লক্ষ ২০ হাজারেরও বেশি সৈনিক। তাই যুদ্ধের শেষে বিশ্বের কোটি কোটি জনগণের চোখে সোভিয়েট লালফৌজ ও কমরেড স্ট্যালিন হয়ে ওঠেন ভরসা ও সংগ্রামী প্রেরণার উৎসস্থল, বিশ্বে গণতন্ত্র রক্ষার অগ্রগামী বাহিনী, বিশ্বশান্তির অগ্রদূত।

মানবতাবাদী ধারার শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অভিনন্দন

সোভিয়েট ভূখণ্ডে যখন লালফৌজ এবং সোভিয়েট জনগণ মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত তখন বিশ্বে মানবতাবাদী ধারার শ্রেষ্ঠ সন্তান — মনীষী রম্যাঁ রোল্যাঁ, শিল্পী চার্লি চ্যাপলিন, সাহিত্যিক বার্নার্ড শ', বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কণ্ঠে উদ্বেগ, এই যুদ্ধে সোভিয়েটকে সহায়তা দেবার জন্য বিশ্ববাসীর কাছে তাঁরা আহ্বান জানান। মনীষী রম্যাঁ রোঁল্যা তখন আহ্বান জানাচ্ছেন ঃ '…সমস্ত স্বাধীন মানুষকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে, রাশিয়া আজ বিপন্ন এবং সে যদি ধ্বংস হয়ে যায় তখন কেবল পৃথিবীর মজুরেরাই শিকলে বাঁধা পড়বে না — কী সামাজিক কী ব্যক্তিগত সবরকমের স্বাধীনতাই বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিশ্ব কয়েক যুগ পিছিয়ে যাবে। রুশ বিপ্লবের মত এত শক্তিশালী ও এতখানি সম্ভাবনাময় সামাজিক আন্দোলন বর্তমানে ইউরোপে আর হয়নি। আসুন, এর সাহায্যে আমরা দ্রুত এগিয়ে যাই।' ইতিপূর্বে ১৯৩৫ সালের এপ্রিলে গান্ধীজীকে লেখা এক চিঠিতে তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন, 'এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ইউরোপে যদি ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে সে জাপানের সাথে হাত মেলাবে এবং সম্ভব হলে হাত মেলাবে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সাথেও, যাতে সোভিয়েট রাশিয়াকে নিশ্চিহ্ন করা যায়। …আমাদের তাই সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য হচ্ছে সোভিয়েট

রাশিয়াকে রক্ষা করা। সামাজিক নির্মাণকাণ্ডের আশা ভরসার সে অপরিহার্য ভিত্তি।'

১৯৪২ সাল। আমেরিকায় বহু পূর্ব থেকেই সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন সহ সমস্ত প্রচারমাধ্যম কমিউনিস্ট ও সোভিয়েট বিদ্বেষে ভরপুর;আমেরিকার মানুষও সেই বিষে জর্জরিত। এতদ্‌সত্ত্বেও ম্যাসিডন স্কোয়ারের খোলামঞ্চে উঠে দাঁড়ালেন বিশ্বখ্যাত অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিন। ক্যামেরার সামনে নয়, নয় কোন অভিনয়ের ডায়লগ ; বরং অভিনয়ের চাইতেও মূর্ত হৃদয়-নিঙড়ানো আবেগে জনতার প্রতি তাঁর আকুল আবেদন ঃ 'আমি কমিউনিস্ট নই, সাধারণ মানুষ। আমি অনুভব করি, কমিউনিস্টরাও হাত-পা কাটা গেলে ব্যথা পায়। এই মুহূর্তে যেকোন দেশের মত রাশিয়ার মা-ও কাঁদছেন — সন্তান তাঁর ফেরেনি। ···রাশিয়ার রণক্ষেত্রেই আজ গণতন্ত্রের জীবন-মৃত্যু নির্ভর করছে। মিত্রশক্তির ভাগ্য আজ কমিউনিস্টদের হাতে। ···আমরা কোন অজুহাতেই রাশিয়াকে হারাতে চাই না, কারণ সে-ই হচ্ছে গণতন্ত্র রক্ষার অগ্রগামী বাহিনী।' আমেরিকা জুড়ে তাঁর বিরুদ্ধে পত্রপত্রিকায় ঘৃণা ছড়ানো শুরু হল — বলা হল, চ্যাপলিন কমিউনিস্ট দরদী। ১৯৪৭ সালে সেই ঘৃণা পূর্ণতা লাভ করে। তাঁর নামে চতুর্দিকে পোস্টার পড়ে — 'অকৃতজ্ঞ ও কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল চ্যাপলিন আমেরিকা থেকে দূর হটো, চ্যাপলিনকে রাশিয়ায় পাঠিয়ে দাও, বিদেশিটাকে লাথি মেরে এদেশ থেকে তাড়াও ...' ইত্যাদি। এর জবাবে চ্যাপলিন স্পষ্ট করে বলেন, 'আমি জানিনা, কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল বলতে আপনারা কী বলতে চাইছেন। আমি এটাই বলব যে, যুদ্ধের সময়ে আমি রাশিয়ার প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলাম, কারণ, আমার বিশ্বাস রণক্ষেত্রে আসল লড়াইটা তারাই লড়ছিল, সেই স্মৃতি আজও আমার মনে জ্বলজ্বল করছে এবং আমি মনে করি, আমার ধন্যবাদ তাদের প্রাপ্য।' শেষপর্যন্ত এই মহান শিল্পীকে আমেরিকা থেকে নির্বাসিত করা হয়।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়েছিলেন ১৯৩১ সালে। স্ট্যালিন তখন দল ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতা। সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, '···আপাতত রাশিয়ায় এসেছি — না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত। ···হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ-পনের বছরে জিতব বলে এরা পণ করেছে। অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্ধর্ষ। পৃথিবীতে যেখানে সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান, সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না আসা আমার পক্ষে অমার্জনীয় হতো।' বলেছিলেন, 'সোভিয়েটরা ব্যক্তিগতভাবে ধনীকে বঞ্চিত করেছে, কিন্তু যে ঐশ্বর্যে সমস্ত

মানুষের চিরদিনের অধিকার — বর্বরের মতো তাকে নষ্ট হতে দেয়নি। এতদিন যারা পরের ভোগের জন্য জমি চাষ করে এসেছে, এরা তাদের যে কেবল জমির স্বত্ব দিয়েছে তাই নয়, জ্ঞানের জন্য আনন্দের জন্য মানবজীবনের যা কিছু মূল্যবান — সমস্ত তাদের দিতে চেয়েছে।' আরও লেখেন, 'বর্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়। ··· বর্তমান রুগ্ন যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা।' সেই সোভিয়েট ও বলশেভিক নীতি যখন ফ্যাসিস্ট জার্মানির আক্রমণে বিপর্যস্ত হচ্ছে তখন কবি রোগশয্যায় — মৃত্যুশয্যায়। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ লিখছেন, 'জার্মানি যখন রাশিয়া আক্রমণ করল, অসুখের মধ্যেও বারবার খোঁজ নিয়েছেন রাশিয়াতে কী হচ্ছে। বারেবারে বলেছেন, সবচেয়ে খুশি হই রাশিয়া যদি জেতে। সকালবেলা অপেক্ষা করে থাকতেন যুদ্ধের খবরের জন্য। যেদিন রাশিয়ার খবর একটু খারাপ, মুখ ম্লান হয়ে যেত, খবরের কাগজ ছুঁড়ে ফেলে দিতেন। যেদিন অপারেশন করা হয় সেদিন সকালবেলায় অপারেশনের আধঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা — রাশিয়ার খবর বলো। বললুম, একটু ভাল মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে। মুখ উজ্বল হয়ে উঠলো, 'হবে না? ওদেরই তো হবে। পারবে, ওরাই পারবে।' ১৯৪১ সালের ২৯ জুলাই হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় বড় হরফে প্রকাশিত হল, 'সোভিয়েটের বিরাট জয়, নাৎসি পদাতিক বাহিনী পর্যুদস্ত, ১৩৪টি জার্মান যুদ্ধ-বিমান ভূপতিত।' পরদিন রবীন্দ্রনাথের অপারেশন। নির্মলকুমারী মহলানবিশ 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে লিখছেন — সকালে অপারেশনের আগে 'যুদ্ধজয়ের খবর শুনে কবির মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললেন, ভারী অহংকার হয়েছে হিটলারের। গোয়েরিং। গোয়েরিং। এখন দেখুক গোয়েরিং, কী হয়। ···রাশিয়ানরা খুব বীরত্ব দেখাচ্ছে, অসম্ভব লড়ছে। মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।' যুদ্ধরত রাশিয়ার প্রতি গভীর উদ্বেগ ও ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছিল বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কণ্ঠেও। তাঁর নেতৃত্বে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষরিত জনগণের প্রতি আবেদন প্রকাশিত হয় ১৯৪১-এর ২০ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকায়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ সরকারের সিঙ্গাপুর বেতার কেন্দ্র এক ভাষণে বলেন, 'আজ যদি ইউরোপে এমন কোনও একজন মাত্র ব্যক্তি থাকেন যাঁহার হাতে আগামী কয়েক দশকের জন্য ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাগ্য ন্যস্ত হইবে, তিনি হইলেন মার্শাল স্ট্যালিন। সুতরাং সোভিয়েট ইউনিয়ন কী করে না-করে তাহার দিকে সর্বাধিক আগ্রহ লইয়া গোটা বিশ্ব এবং সর্বোপরি গোটা ইউরোপ তাকাইয়া থাকিবে।'

কমিউনিস্ট না হলেও সাহিত্যিক বার্নার্ড শ' কমিউনিজম, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও মহান নেতা স্ট্যালিন সম্পর্কে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। বলেন, 'রুশ রাষ্ট্রবিদ্‌রা আবিষ্কার করেছেন সত্যিকারের স্বাধীন দেশ — যেখানে দেশের মালিক সত্যিই জনসাধারণ, ··· কমিউনিজম বেয়াড়া ডিক্টেটরশিপ অথবা কমিটি অফ পাবলিক সেফটি সৃষ্টি করে না। ···কমিউনিজম সৃষ্টি করে একটা আত্মত্যাগী গণতান্ত্রিক সেবক সম্প্রদায়, এরা গড়ে তোলে গণতান্ত্রিক সংঘ ও শাসনব্যবস্থা, পেছনে থাকে একটা সর্বজনীন প্রেরণা এবং নির্লোভ পবিত্রতার সঙ্কল্প।' (বার্নার্ড শ', জে ভি স্ট্যালিনের সহিত সাক্ষাৎকার)। ১৯৪৮ সালে ১৪ মার্চ এলানার ও' কনেল সাহিত্যিক বার্নার্ড শ'-এর সঙ্গে দেখা করতে যান। শ' তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'কেন তুমি আমেরিকা যেতে চাইছ? কনেল উত্তর দেন, 'আমি ইংলণ্ডে যে স্বাধীনতা পাচ্ছি, তার থেকে বেশি স্বাধীনতা পেতে চাই বলে।' শ' জবাব দিলেন, 'পৃথিবীতে একটিমাত্র দেশ আছে যেখানে তুমি সত্যিকারের স্বাধীনতা পেতে পারো — তার নাম রাশিয়া, যেখানে মহান স্ট্যালিন আছেন।' (জি বি এস — এ পোস্টস্ক্রিপ্ট, হেসকিথ পিয়ার্সন)।

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন, নিজে ইহুদি পিতার সন্তান হওয়ার অপরাধে নাৎসি বাহিনীর অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি। তিনি লিখছেন ঃ 'নাৎসি সন্ত্রাস যখন ছড়িয়ে পড়ল প্রধানত ইহুদিদের বিরুদ্ধে, তখন বাকী বিশ্ব দেখতে লাগল উদাসীন দৃষ্টিতে। ···হিটলার যখন রোমানিয়া ও হাঙ্গেরিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল ···এবং গ্যাসচেম্বারে নৃশংস হত্যার কাহিনী সমগ্র বিশ্ব জেনেও গেল, তখনও রোমানিয়ান ও হাঙ্গেরিয়ান ইহুদি বংশোদ্ভূতদের রক্ষার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে গেল, কারণ প্যালেস্টাইনে ইহুদি উদ্বাস্তুদের ঢোকার দরজা বৃটিশ সরকার বন্ধ করে দিল···। কিন্তু আমরা সোভিয়েট ইউনিয়নের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ভুলতে পারিনা। নাৎসিবাহিনী যখন পোল্যাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ল, তখন বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে সোভিয়েটই একমাত্র দেশ যারা লক্ষ লক্ষ ইহুদিদের জন্য তাদের দেশের সমস্ত দরজা খুলে দিয়েছিল।' (আইডিয়াজ অ্যান্ড ওপিনিয়ন্‌স; দি ওয়ার ইজ ওন, বাট দি পিস ইজ নট — আইনস্টাইন)। ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত তাঁর 'হোয়াই সোস্যালিজম' প্রবন্ধে তিনি লিখছেন ঃ 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই সমস্ত অমঙ্গলকে নির্মূল করার একটিমাত্র উপায় আছে — তা হল একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন ও তার সঙ্গে সমাজমুখী একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই অর্থনীতিতে সমাজের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপাদন হয় বলে তা কর্মক্ষম সমস্ত মানুষের কাজের সংস্থান করবে এবং শিশু থেকে শুরু করে প্রতিটি নরনারীর জীবিকা অর্জনকে সুনিশ্চিত করবে।' আরও বললেন, 'সমাজতন্ত্র

একটি সামাজিক ও নৈতিক পূর্ণতার পথনির্দেশ করে।'

সোভিয়েটের মর্যাদাকে খাটো করে দেখাতে সাম্রাজ্যবাদীদের অপচেষ্টা

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের ঐতিহাসিক সংগ্রাম ও বিজয় একদিকে যখন বিশ্ববাসীর দ্বারা, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের দ্বারা, বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্বদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছে, অন্যদিকে তখন থেকেই বৃটেন, আমেরিকার মত পশ্চিমী শক্তিগুলি নানাভাবে সোভিয়েটের মহত্ত্বকে খাটো করে দেখানোর অপচেষ্টা চালিয়েছে এবং এখনও তা চালিয়ে যাচ্ছে। সোভিয়েট লালফৌজের প্রাক্তন জেনারেল ফিলিপ ববকভ-এর ভাষায় ঃ 'নাৎসি আক্রমণ থেকে ইউরোপকে মুক্ত করতে সোভিয়েট বাহিনী যে ভূমিকা পালন করেছিল, যুদ্ধের পরবর্তীকালেও যেমন, ঠিক তেমনি যুদ্ধ চলাকালীনও তাকে খাটো করে দেখানো হচ্ছিল। ···আমাদের মিত্রপক্ষের সঙ্গীরা বিশেষত গ্রেট বৃটেন ও ব্যক্তিগতভাবে চার্চিল দেখাতে চেয়েছিলেন যে, এই জয়ের প্রধান ভূমিকায় ছিলেন কেবলমাত্র তাঁরাই, এবং সুনির্দিষ্টভাবে বৃটেন।' হলিউডে এমন সব সিনেমা বানানো হয়েছে, যেগুলিতে দেখানো হয়েছে আমেরিকা ও বৃটেনই হিটলারবাহিনীকে পরাস্ত করেছে, বিশ্বকে তাদের সন্ত্রাস থেকে উদ্ধার করেছে; সোভিয়েটের ভূমিকা সেখানে অতি নগণ্য। ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ৬০ বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে এবছরও এইসব ছবি দেখিয়েছে পশ্চিমী টিভি চ্যানেলগুলো। শুধু তাই নয়, এবার নানা সভায়, টিভির পর্দায়, সংবাদমাধ্যমে তারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রবীণ সৈনিক ও বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য এমনভাবে উপস্থাপিত করেছে যার দ্বারা সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং পূর্ব রণাঙ্গণে তাদের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে গুরুত্বহীন করে দেখানো যায়। সেই সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের উদ্যোগে নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত পশ্চিমী ইতিহাস গ্রন্থে ৬০ বছর আগের সেই সংগ্রামের ইতিহাসকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলা হচ্ছে; তাতে দেখানো হচ্ছে যে, যুদ্ধপীড়িত ইউরোপকে উদ্ধার করতে আমেরিকার আবির্ভাব ঘটেছিল এবং ইউরোপকে নাৎসি বর্বরতার দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছে আমেরিকাই। সেই সঙ্গে ফ্যাসিস্টবাহিনীর বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক লড়াইয়ের প্রধান সেনাপতি মহান স্ট্যালিন সম্পর্কে এবং সোভিয়েট জনগণ ও তার গৌরবময় লালফৌজ সম্পর্কে অজস্র নোংরা কুৎসা ও মিথ্যাপ্রচার চালানো হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন এবং তার পরবর্তীতে জন্মানো নতুন প্রজন্মের বিশ্ববাসীকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করতে একশ্রেণীর তথাকথিত 'ঐতিহাসিক' বিপুল মার্কিন ডলারের

কাছে নিজেদের বিবেক বিক্রি করে মিথ্যার ইতিহাস লিখছেন। তাঁরা হিটলার ও স্ট্যালিনকে 'যমজ শয়তান' হিসাবে দেখাচ্ছেন এবং ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজমকে সমগোত্রীয় সন্ত্রাসবাদ বলে আখ্যায়িত করছেন; এজন্য তাঁরা বিশেষভাবে তুলে ধরছেন ১৯৩৯ সালের ২৪ আগস্ট জার্মানির সঙ্গে সোভিয়েটের অনাক্রমণ চুক্তিকে।

সাম্রাজ্যবাদীদের ডলার-পুষ্ট ঐতিহাসিকরা নতুন করে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পরাজয়ের ইতিহাস লিখছেন, কিন্তু তাঁরা ভুলেও এই প্রশ্নগুলির উত্তর করছেন না যে, (১) জাপান-জার্মানি-ইতালির সম্মিলিত জোটের বিরুদ্ধে এই পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি প্রথমেই কেন সংঘবদ্ধ জোট গঠন করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে রাজি হল না? যৌথ নিরাপত্তা গঠন সম্পর্কে সোভিয়েটের বারংবার আবেদনে সাড়া না দিয়ে তারা কেন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে মদত দিল? কেন তারা জার্মানির সমরশিল্পে বিপুল অর্থ লগ্নী করে তাদেরকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল? কেন তারা বিভিন্ন দেশ দখলে ফ্যাসিস্টদের উৎসাহ জোগালো? ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স মিউনিকে কেন জার্মানি ও ইতালির সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহায্য করল ? (২) ঐ ঐতিহাসিকরা এই প্রশ্নেরও জবাব দেন না যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন যখন ফ্যাসিস্ট হানাদার বাহিনীর সঙ্গে মরণপণ লড়াই লড়ছে তখন তাদের বারবার আবেদন সত্ত্বেও বৃটেন ও আমেরিকা কেন পশ্চিম রণাঙ্গণে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলে হিটলার বাহিনীকে আক্রমণ করল না? বরং হিটলার যাতে তার সর্বশক্তি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে, দ্বিতীয় ফ্রন্ট না খোলার দ্বারা সেই ব্যবস্থাই তারা কেন করে দিল? (৩) সোভিয়েট যখন টানা তিন বছর অবরুদ্ধ থাকার পর শেষপর্যন্ত ঘুরে দাঁড়ালো এবং হিটলারবাহিনীর পরাজয় শুরু হল, তখন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল কেন জার্মানি ও আমেরিকার সঙ্গে মিলিতভাবে সোভিয়েট আক্রমণের প্ল্যান ছকেছিল ? ['রিয়া নোভস্তি' পত্রিকার মিলিটারি কমেন্টেটর ভিক্টর লিটোভকিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে (দি স্টেটসম্যান ৪-৫-০৫) গবেষক ডঃ ভ্যালেন্টিন এম ফালিন বৃটেনের নিজস্ব ডকুমেন্ট থেকে প্রাপ্ত এই তথ্যটি তুলে ধরেছেন। এ বিষয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।] (৪) পোল্যাণ্ড সীমান্তের যে আউশভিৎস কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে বিপুল সংখ্যক ইহুদিকে ধরে এনে নৃশংসভাবে হিটলার হত্যা করেছে, সেই মারণক্যাম্পের সঙ্গে যুক্ত রেললাইনটাকে অবিলম্বে বিমান আক্রমণের দ্বারা ধ্বংস করার জন্য সোভিয়েট অনুরোধ জানিয়েছিল; কারণ সোভিয়েটের পক্ষে সেখানে পৌঁছানোর পথ ছিল রুদ্ধ। বৃটেন ও আমেরিকা সোভিয়েটের সেই আবেদনে কর্ণপাতও

করেনি; কেন? (৫) রোমানিয়ার যে পোলেইস্তি তৈলক্ষেত্র থেকে নাৎসিবাহিনীর যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় তেল সরবরাহ হচ্ছিল, সেই তৈলক্ষেত্রটিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়ে নাৎসিবাহিনীকে গুরুতর আঘাত হানার জন্য সোভিয়েট ১৯৪১ সালে বৃটেন ও আমেরিকাকে বারবার অনুরোধ করেছিল এবং সেক্ষেত্রে ক্রিমিয়ার বিমানবন্দরও তাদের ব্যবহারের জন্য খুলে দিতে চেয়েছিল; কিন্তু তারা কর্ণপাতও করেনি। অথচ ১৯৪৪ সালে সোভিয়েট লালফৌজ যখন সেই তৈলক্ষেত্রের দখল নেওয়ার দিকে এগুচ্ছে, ঠিক তখনই বোমা মেরে সেটিকে উড়িয়ে দিল বৃটেন-আমেরিকার বিমানবাহিনী। এর নাম ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ, নাকি সোভিয়েট বিরোধী যুদ্ধ? (৬) লালফৌজ যখন বিজয় অভিযানে এগিয়ে চলেছে জার্মানির দিকে, তখন লালফৌজের গতি আটকাতে ড্রেসডেনে এলবে নদীর উপর বৃটেন-আমেরিকা ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে সমস্ত সেতু উড়িয়ে দিয়েছিল কেন? (৭) ওরেনিয়েনবুর্গে ছিল জার্মানির মূল্যবান পারমাণবিক গবেষণাগার; লালফৌজের অপ্রতিহত অভিযানে তা অচিরেই তাদের দখলে চলে যাবে বুঝতে পেরে বৃটেন-আমেরিকার বিমানবাহিনী আচমকা বোমাবাজি করে সেই গবেষণাগার সহ কর্মরত বিজ্ঞানী, কর্মচারী ও যন্ত্রপাতি সমস্ত ধ্বংস করে দিয়েছিল কী উদ্দেশ্যে? (৮) যুদ্ধ পরবর্তীকালে নাৎসিবাহিনীর চরম অত্যাচারী বড় বড় অফিসার এবং তাদের গোয়েন্দা বাহিনীর অফিসাররা, যুদ্ধাপরাধী হিসাবে যাদের শাস্তি প্রাপ্য ছিল, তারা গোপন আশ্রয় লাভ করেছিল আমেরিকায়; পরবর্তীকালে জানা গিয়েছে এইসব যুদ্ধাপরাধীদের শয়তানি-বুদ্ধিকে মার্কিন শাসকরা ব্যবহার করেছে বিভিন্ন দেশের উপর হানাদারি চালানোর ক্ষেত্রে। এটা কি ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামের মার্কিন কৌশল?

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানিকে সাম্রাজ্যবাদীদের মদত

বাস্তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায় ১৯৩১ সালে ; জাপ সাম্রাজ্যবাদ মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে কমিউনিজমের হাত থেকে এশিয়াকে বাঁচানোর অজুহাতে। দু-বছর পর ১৯৩৩ সালে ঐ একই অজুহাতে অর্থাৎ কমিউনিজমের গ্রাস থেকে জার্মানিকে উদ্ধার করতে হিটলার ক্ষমতাসীন হয়ে জার্মান প্রজাতন্ত্রের (ভাইমার রিপাবলিক) উচ্ছেদ করে ফ্যাসিবাদ কায়েম করেন। ১৯৩৫ সালে একই যুক্তি তুলে ইটালি ইথিওপিয়া দখল করে নেয়।

১৯১৪-১৮'র প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানির উপর বিজয়ী ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স চাপিয়ে দিয়েছিল ভার্সাই চুক্তি; উদ্দেশ্য ছিল জার্মানির আর্থিক ও সামরিক

মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া। তবু সেই জার্মানি এত দ্রুত সামরিক দিক থেকে ক্ষমতাশালী ও আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারল, তার অন্যতম কারণ, একেবারে প্রথম থেকেই তারা ধারাবাহিকভাবে বৈদেশিক অর্থসাহায্যে পুষ্ট হয়েছে। এই সহায়তার ক্ষেত্রে প্রথম নাম করতে হয় আমেরিকার। তারা জার্মান শিল্পে বিশেষত তাদের সমরাস্ত্র নির্মাণশিল্পে ব্যাপক অর্থলগ্নী করেছিল। বৈদেশিক ঋণের ৭০ ভাগই ছিল আমেরিকার। হিটলার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আমেরিকা ও বৃটেনের পুঁজি স্রোতের মতো ঢোকে জার্মানির সমরশিল্পে। (সূত্র ঃ আত্মজীবনী ঃ মার্শাল ঝুকভ) হিটলারের জার্মানি কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিশেষত সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যেভাবে মাথা তোলে তাতে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড ভার্সাই চুক্তি একরকম তুলেই নেয় এবং জার্মানি যাতে দ্রুত অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হতে পারে, সেই সাহায্যই তারা করতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মার্কিন শিল্পপতিরা জার্মানিতে ১০০ কোটি ডলার লগ্নি করেছিল (সূত্র ঃ দাস ওয়ারস আর মেড — অধ্যাপক মর্ডেন)। মার্কিন শিল্পপতিদের সহায়তায় জার্মানি ১৯৩৮ সালে কৃত্রিম জ্বালানি উৎপাদনের পরিমাণ ১৬ লক্ষ টনে নিয়ে যায় (সূত্রঃ ভিক্টর মাৎসুলেস্কো)।

প্রথমত, যে 'সার' অঞ্চল নিয়ে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানির বিবাদ ছিল, ফ্রান্স সেটা জার্মানিকে ফিরিয়ে দেয় ১৯৩৫ সালের প্রথমেই। কয়লাখানি সমৃদ্ধ এই সার অঞ্চলই হল জার্মানির শিল্পকেন্দ্রের প্রাণ। এর ১৫ দিন বাদেই হিটলার প্রকাশ্যে যখন ঘোষণা করে — ভার্সাই চুক্তি মানতে জার্মানি বাধ্য নয়, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স কেউ তখন বাধা দেয়নি, মৌখিক প্রতিবাদও করেনি। এরপর 'জাতিসংঘ মানি না' হুঙ্কার দিয়ে জার্মানি ও জাপান জাতিসংঘ ত্যাগ করে। তখন সোভিয়েট ইউনিয়ন জাতিসংঘে প্রবেশ করে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সমবেত প্রতিরোধের চুক্তি সম্পাদনের আহ্বান জানায় জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলির কাছে এবং তখন থেকেই তারা নাৎসিদের সংযত করার জন্য 'গণতন্ত্রী শক্তিগুলি'র মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে থাকে।

ভার্সাই চুক্তি অনুসারে জার্মানির রাইনল্যাণ্ড ছিল ফ্রান্সের সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে, যদিও সেখানে উৎপাদনমূলক কাজকর্ম করত জার্মানি। ১৯৩৬-এর ৭ মার্চ হিটলার ফ্রান্সের মনোভাব পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে কয়েকটা সামরিক ট্যাঙ্ক ঢুকিয়ে দেয় রাইনল্যাণ্ডে, সঙ্গে কিছু সেনা। ফ্রান্স রুখে দাঁড়ায়নি, বরং তার সব সেনা সরিয়ে নিয়ে যায়। এই রাইনল্যাণ্ডের সামরিক কারখানা গোটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানিকে সবচেয়ে বেশি ট্যাঙ্ক জোগান দিয়েছে। ফ্রান্স নিঃশব্দে রাইনল্যাণ্ডের সামরিক কর্তৃত্ব তুলে দেয় জার্মানির হাতে। হিটলার সেখানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। কিছুদিনের মধ্যে হিটলার জার্মানিতে বাধ্যতামূলক

সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন করে এবং তার পরের মাসেই দুনিয়া শুনলো, নাৎসি জার্মানি এক বিরাট বিমানবাহিনী গড়ে তুলেছে। বৃটেন ও ফ্রান্স তখন হিটলারের এই সামরিক আয়োজনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করে গিয়েছে। বৃটেনের যে ধনিকরা যুদ্ধের অসম্ভব ক্ষতিপূরণ দাবি করে জার্মান গণতন্ত্রের শ্বাসরোধ করে দিয়েছিল, তারাই এখন হিটলারকে সাহায্য করতে শুরু করে দেয় জার্মানিতে অর্থ লগ্নি করে এবং নগদ ঋণ জুগিয়ে। 'ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ড' জার্মানির অস্ত্রসজ্জার জন্য অর্থ জোগায়, বৃটিশ সমরাস্ত্র নির্মাণ কারখানা 'ভিকার্স আর্মস্ট্রং কোম্পানি' জার্মানিকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে থাকে। অন্যদিকে ফ্রান্সের একচেটিয়া পুঁজির মালিকরাও হিটলারকে সমর্থন করে। হিটলারের যুদ্ধ আয়োজনের অন্যতম প্রধান সমস্যা জার্মানিতে আকরিক লোহার অভাব। সেই অভাব পূরণ করতে এগিয়ে আসে ফ্রান্সের পুঁজিপতিরা। তারা হিটলারকে ফ্রান্সের লোরেন খনির লৌহ আকরিক সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করে। চুক্তি অনুযায়ী তারা জার্মানিকে প্রতি বছর সাড়ে তিনশো কোটি মার্কেরও বেশি মূল্যের (১৯৩০-এর দশকের হিসাবে) লৌহ আকরিক জোগাতে থাকে। সোভিয়েট ইউনিয়ন স্পষ্ট বুঝতে পারে, তার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীরা কীভাবে নতুন করে সংঘবদ্ধ হচ্ছে। এরপর ১৯৩৬-এর নভেম্বরের শেষদিকে জার্মানি ও জাপান সোভিয়েট বিরোধী অভিযানের চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। জার্মান ও ইটালির সেনাবাহিনী কমিউনিজমের কবল থেকে স্পেনবাসীকে মুক্ত করার ডাক দিয়ে স্পেন আক্রমণ করে; বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসকরা কেউ বাধা দেয়নি, মৌখিক একটা প্রতিবাদও করেনি। সোভিয়েট বিরোধী চুক্তিতে ১৯৩৭ সালে ইটালিও যোগ দেয়। জাপান ইতিমধ্যে চীন আক্রমণ করে পাইপিং, তিয়েনৎসিন এবং সাংহাই দখল করে নিয়েছে। পরের বছর ১৯৩৮-এর ১১ মার্চ অস্ট্রিয়া চলে যায় জার্মানির দখলে।

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিবাদীরা সরাসরি সংঘবদ্ধ হয়

পৃথিবীর সামনে তখন মাত্র দুটি পথ খোলা। প্রথম পথ হল, ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে অন্যান্য দেশগুলিকে সংঘবদ্ধ করা এবং এই সংঘশক্তির চাপে ফ্যাসিস্টদের অভিযান সময় থাকতেই প্রতিহত করা। দ্বিতীয় পথ হল, বিনা প্রতিরোধে ফ্যাসিস্টদের কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং তাদের বিশ্বজয়ের পথ সুগম করে তোলা। হিটলারবিরোধী সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ চুক্তির জন্য সোভিয়েট বারবার আবেদন জানাতে থাকে বৃটেন, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড, রোমানিয়ার কাছে; জানায় — এই চুক্তি হলে চুক্তিভুক্ত যেকোন দেশ আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

সোভিয়েট লালফৌজ আক্রান্ত রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে ছুটে যাবে এবং সেই রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিতভাবে ফ্যাসিস্টবিরোধী অভিযানে সামিল হবে, তবে লালফৌজ যাবার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে অবশ্যই অনুমতি দিতে হবে। কিন্তু কেউই সোভিয়েটের আবেদনে সাড়া দিল না। বরং ফ্যাসিস্ট প্রচার সচিবরা, ফরাসি-বৃটিশ-মার্কিন দালালরা মিলিত প্রতিরোধের নীতিকে কমিউনিস্ট নীতি বলে প্রচার করতে লাগল, দিবাস্বপ্ন বলে বিদ্রূপ করতে লাগল এবং প্রতিরোধ মানেই 'যুদ্ধের উস্কানি' বলে নিন্দা করতে লাগল। তার বদলে অনুমোদন করা হল আপস ও আত্মসমর্পণের নীতিকে, যে নীতির ফলে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। ১৯৩৮-এর ১১ জুন বৃটিশ পার্লামেন্টের কমন্সসভায় সরকারি দলের স্যার আর্নল্ড উইলসন বলেন ঃ 'আজকের পৃথিবীর বিপদ ফ্যাসিস্ট জার্মানি বা ইতালি নয়, বিপদ কমিউনিস্ট রাশিয়া।' ২৯-৩০ সেপ্টেম্বরে আপসনীতি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। নাৎসি জার্মানি, ফ্যাসিস্ট ইতালি, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স স্বাক্ষর করে মিউনিক চুক্তিতে। সোভিয়েট বিরোধী যে পবিত্র চুক্তির স্বপ্নে সারা দুনিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল কুচক্রীরা ১৯১৮ সাল থেকে বিভোর হয়েছিল, তা বাস্তব রূপ নেয় মিউনিকে। এই চুক্তির ফলে সোভিয়েট রাশিয়া একেবারে কোণঠাসা হয়ে যায়। পূর্ব ইউরোপের পথ নাৎসি জার্মানির সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডে ফিরে হিটলারের সই করা চুক্তিপত্র দেখিয়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন বলেন, 'শান্তি হয়ে গেছে — এই হল শান্তির সনদ।' শুধু তাই নয়, চেম্বারলেন প্রস্তাব দেন — চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদাতেনল্যাণ্ড জার্মানির হাতে তুলে দিতে হবে।

মার্শাল ঝুকভ লিখছেন, 'আমরা (সোভিয়েট লালফৌজ) চেকোশ্লোভাকিয়াকে সামরিক সাহায্য দেবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের বিমানবাহিনী ও ট্যাঙ্কগুলিকে তৈরি রাখা হয়েছিল। পশ্চিম সীমান্তের লাগোয়া অঞ্চলগুলোতে ৪০ ডিভিসন সৈন্য প্রস্তুত। কিন্তু তদানীন্তন চেক-শাসকরা এই সাহায্য নিতে অস্বীকার করে, বরং আত্মসমর্পণকেই শ্রেয় জ্ঞান করে। ১৫ মার্চ (১৯৩৯) জার্মানি প্রাগ (চেক রাজধানী) দখল করে নেয়। হিটলার-তোষণের এটাই ছিল স্বাভাবিক পরিণতি।'

এর ফলে ইউরোপের মধ্যে অস্ত্র নির্মাণের বৃহত্তম কারখানা স্কোডা চলে যায় হিটলারের দখলে। নাৎসিরা যখন চেক-ভূমি দখল করে বসল তখন জানা গেল, বৃটেনের ধনিকরা নবঅধিকৃত শিল্পগুলোতে টাকা খাটানোর জন্য তার কয়েক সপ্তাহ আগেই জার্মানির সঙ্গে চুক্তি করে নিয়েছিল। ২০ মার্চ লিথুয়ানিয়া তার একমাত্র বন্দর মেমেল জার্মানিকে উপহার দিয়ে দেয়। ৭ এপ্রিল ইতালি

আক্রমণ হানে আলবেনিয়ায় এবং ৫ দিনের মধ্যেই দখল করে দেয়।

হিটলারবাহিনী যখন চেকোশ্লোভাকিয়ার বুক চিরে এগিয়ে চলেছে তখন জার্মানিকে প্রতিরোধের পরিকল্পনা করতে সোভিয়েট ইউনিয়ন বৃটেনের কাছে প্রস্তাব রাখে যে, বৃটেন ফ্রান্স পোল্যাণ্ড রোমানিয়া তুরস্ক ও রাশিয়ার অবিলম্বে এ ব্যাপারে একটা আলোচনা সভায় মিলিত হওয়া দরকার। বৃটেন পত্রপাঠ এ প্রস্তাব নাকচ করে দেয়; বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী জানান — না, এখনও তেমন আলোচনার সময় হয়নি।

বৃটেন-আমেরিকা-ফ্রান্সের 'হস্তক্ষেপ না করার নীতি' আসলে কী ছিল

১৯৩৯-এর ১০ মার্চ সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসের অধিবেশনের ভাষণে কমরেড স্ট্যালিন বলেন, "আগ্রাসী রাষ্ট্রগুলি অনাগ্রাসী রাষ্ট্রগুলির, বিশেষ করে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সীমানা সর্বদিক থেকে লঙঘন করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আর অনাগ্রাসী রাষ্ট্রগুলো ক্রমাগত পিছু হটে আসছে এবং একের পর এক সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে আগ্রাসী রাষ্ট্রগুলিকে।..... অবিশ্বাস্য হলেও এটাই বাস্তব।" তিনি বলেন, "অনাগ্রাসী দেশগুলো নিজেদের বিরাট সুবিধাজনক পরিস্থিতি সত্ত্বেও আক্রমণকারীদের তুষ্ট করতে নিজেদের অবস্থান থেকে ও নিজেদের উচিত-কর্তব্য থেকে অতি সহজেই পিছু হটে আসছে এবং কোনরকম প্রতিরোধ ছাড়াই।.... এটা কি অনাগ্রাসী রাষ্ট্রগুলির দুর্বলতার প্রতিফলন? মোটেই নয়। অনাগ্রাসী ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত ক্ষমতা ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলির থেকে প্রশ্নাতীতভাবেই বেশি, অর্থনৈতিক ও সামরিক উভয় দিক থেকেই। তাহলে এরা আগ্রাসীদের ক্রমাগত সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে কেন? ... প্রধান কারণ, অনাগ্রাসী দেশগুলির বেশিরভাগ, বিশেষ করে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যৌথ নিরাপত্তার নীতি, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধের নীতি পরিত্যাগ করেছে এবং হস্তক্ষেপ না করার নীতি অর্থাৎ 'নিরপেক্ষ' অবস্থান গ্রহণ করেছে।"

হস্তক্ষেপ না করার নীতি বলতে কী বোঝায়? স্ট্যালিন বলেন, "কেতাবী অর্থ হচ্ছে — আগ্রাসীদের আক্রমণ থেকে প্রতিটি দেশ যেভাবে খুশি নিজেদের রক্ষা করুক, নিজেদের সর্বোচ্চ শক্তি ব্যবহার করুক — এটা আমাদের ভাববার বিষয় নয়। আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত — উভয় রাষ্ট্রের সঙ্গেই আমরা ব্যবসা করব।" কিন্তু বাস্তবে এই নীতির অর্থ হচ্ছে, আগ্রাসনের ষড়যন্ত্রে হাত মেলানো, যুদ্ধ আরও ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা করা, এবং ফলস্বরূপ যুদ্ধকে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত

হতে দেওয়া। হস্তক্ষেপ না করার নীতির দ্বারা তারা চাইছে ..... সকল যুদ্ধবাজ রাষ্ট্র যুদ্ধের গভীর আবর্তে ডুবে যাক এবং সেজন্য তারা চাইছে তলে তলে যুদ্ধকে উৎসাহিত করতে; তারা চাইছে — যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধ করে করে নিজেরা দুর্বল হোক, ধ্বংস হোক এবং তারপর যখন ওরা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়বে তখন তারা পূর্ণশক্তি নিয়ে মঞ্চে আবির্ভূত হবে, আবির্ভূত হবে অবশ্যই 'শান্তির স্বার্থে', এবং যুদ্ধে দুর্বল হয়ে পড়া রাষ্ট্রগুলির উপর শর্ত চাপাবে। কী সস্তা ও সহজ!" তিনি আরও বলেন, "কোন কোন ইউরোপীয় ও মার্কিন রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক সোভিয়েট-ইউক্রেনের উপর জার্মান আক্রমণের প্রতীক্ষায় দিন গুণতে গুণতে অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। তাঁদের হস্তক্ষেপ না করার নীতির পিছনে কী মতলব আছে তা তাঁরা নিজেরাই বলতে শুরু করেছেন। খোলাখুলিভাবে সংবাদপত্রে তাঁরা লিখছেন যে, জার্মানরা তাদের ভীষণ 'নিরাশ' করেছে, কারণ, আরও পূর্বদিকে অভিযান চালানো ও সোভিয়েটের উপর আক্রমণ করার বদলে তারা পশ্চিমদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এখন উপনিবেশ দাবি করছে। .... সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর আক্রমণ হানবে — এই বোঝাপড়ার ভিত্তিতে জার্মানির হাতে চেকোশ্লোভাকিয়ার কয়েকটা জেলা তুলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু জার্মানি এখন তার প্রতিদান দিতে অস্বীকার করছে, এবং তাদেরই জাহান্নামের রাস্তা দেখাচ্ছে।" এমনিভাবে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আসল মতলব উদ্‌ঘাটিত করে দেখান স্ট্যালিন।

বৃটেনের শঠতাপূর্ণ কালক্ষেপ

এতদ্‌সত্ত্বেও সোভিয়েট সরকার আক্রমণকারী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সম্মিলিত প্রতিরোধ ও নিরাপত্তার বাস্তব নীতি কার্যকর করবার জন্য বৃটেনের কাছে মৈত্রী প্রস্তাব পাঠায়। বৃটেন সেই প্রস্তাব খারিজ করে দেয়। তখন বৃটেনবাসীই প্রশ্ন তোলে, প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন নিজে হিটলারের সঙ্গে কথাবার্তা চালালেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে নিজে জার্মানিতেও গেলেন; রোমে গিয়ে তিনি মুসোলিনির সঙ্গে এক টেবিলে খানা খেয়ে তাঁর কত গুণগানই না করলেন! অথচ সোভিয়েটের ক্ষেত্রে উল্টো নীতি কেন? চেম্বারলেন তখন বাধ্য হয়ে ২৫ মে মস্কোস্থ বৃটিশ ও ফরাসি দূতকে সোভিয়েটের সঙ্গে মৈত্রী সম্বন্ধে কথাবার্তা বলার নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যেই জার্মানদের চেকোশ্লোভাকিয়া দখলের পর অতি মূল্যবান দশটি সপ্তাহ নষ্ট করা হয়। আরও তিন সপ্তাহ নষ্ট করা হয় একজন মিঃ স্ট্র্যাং-এর মস্কো পৌঁছানোর প্রতীক্ষা করে। কে এই স্ট্র্যাং? ইনি বৃটেনের মন্ত্রীমণ্ডলীর নগণ্যতম ব্যক্তিও নন,

বৈদেশিক দপ্তরের একজন কেরানী। তিনি মস্কো পৌঁছলে দেখা গেল যে, কোন কিছুতে স্বাক্ষর দেবার ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হয়নি। তবু কথাবার্তা চলে ৭৫ দিন ধরে, তার মধ্যে বৃটিশ পক্ষ ৫৯ দিন লাগিয়ে দেয় শুধু প্রস্তাবটা লিখতে। বেশ বোঝা যায়, বৃটেন অযথা কালক্ষেপ করতে চাইছে। আলোচনা চলাকালীনই হঠাৎ ফাঁস হয়ে যায়, বৃটেনের বহির্বাণিজ্য দপ্তরের পরিষদ সম্পাদক জার্মানির সঙ্গে কয়েক হাজার কোটি পাউণ্ড ঋণদান সম্পর্কে গোপনে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। ক্রমশ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সোভিয়েটকে একাই ফ্যাসিস্ট জার্মানির আক্রমণ প্রতিরোধ করতে হবে, এবং সেই ফ্যাসিস্ট জার্মানির পেছনে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে সমর্থন জানাবে বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা।

সোভিয়েট রাশিয়ায় তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ই ডেভিস প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পরামর্শদাতা হ্যারি হপকিন্সকে একটা চিঠিতে (১৮ জুলাই, ১৯৪১) লিখেছিলেন, "...মিউনিক চুক্তি সই হওয়ার পরও, এমনকী ১৯৩৯ সালের বসন্তকালেও জার্মানি যখন পোল্যাণ্ড ও রোমানিয়া আক্রমণ করে তখনও সোভিয়েট ইউনিয়ন বৃটেন ও ফ্রান্সের পক্ষে লড়তে রাজি ছিল। তার আগে সোভিয়েট শুধু দাবি করেছিল যে, অনাগ্রাসী রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে একটা অধিবেশন বসুক এবং তাতে আগে পাকাপাকিভাবে ঠিক হয়ে যাক — প্রত্যেকের কর্তব্য কী হবে। তারপর সেই মিলিত প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত হিটলারের উপর জারি করা হোক।..... চেম্বারলেন (বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী) এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন.....। সোভিয়েটের তখন স্থির ধারণা হয়, অবশ্যই সে-ধারণা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত যে, বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে বাস্তবিক কাজে লাগার মত কোন বোঝাপড়াই সম্ভব হবে না।"

সোভিয়েট ইউনিয়ন যে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে — হিটলার তা জানতেন। কিন্তু ১৯৩৯ সালে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হলে যা প্রস্তুতি প্রয়োজন তা হিটলারের ছিল না। তাই ইউরোপের অবশিষ্ট দেশগুলি দখল করে, সেইসব দেশের সম্পদ করায়ত্ত করে জার্মান বাহিনীর আক্রমণ-ক্ষমতাকে তিনি চূড়ান্ত মাত্রায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ফলে আপাতত পশ্চিম ইউরোপের দিকে যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ করাই ছিল জার্মানির লক্ষ্য। স্বভাবতই পূর্ণশক্তি পশ্চিমে নিয়োজিত করলে পূর্বে, অর্থাৎ সোভিয়েট সীমান্তে তার সামরিক শক্তি প্রয়োজনের তুলনায় দুর্বল থাকবে। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব সীমান্ত নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার আশু প্রয়োজনে জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তির প্রস্তাব পেশ করে সোভিয়েটের কাছে। চার্চিল তাঁর 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস' বইয়ের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন

— রাশিয়া, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সকে নিয়ে ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য রুশ-প্রস্তাব বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন খারিজ করেন। এরপর ১৯ আগস্ট স্ট্যালিন রুশ-জার্মান চুক্তির বিষয়টি পলিটব্যুরোতে রাখেন। এরপরই ২২ আগস্ট হিটলারের স্বরাষ্ট্রসচিব রিবেনট্রপ মস্কো আসেন এবং ২৪ আগস্ট রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

কিন্তু, অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হওয়া মাত্রই জার্মানি চুক্তিভঙ্গ করে সোভিয়েট আক্রমণ করবে — সোভিয়েট নেতৃত্ব তা জানত। তবু যতটুকু সময় এর ফলে পাওয়া যাবে সেই সময়ের মধ্যে যুদ্ধ-প্রস্তুতি আরও শক্তিশালী করে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে সোভিয়েটকে রক্ষা করাই ছিল তার অন্যতম লক্ষ্য। তাছাড়া এই চুক্তি স্বাক্ষর করে সোভিয়েট বিশ্ববাসীকে এটাও বুঝিয়ে দেয় যে, তারা যুদ্ধ চায়না, তারা শান্তিকামী। পরবর্তীকালে সোভিয়েট আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। হিটলার এই চুক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে সোভিয়েটকে আক্রমণ করেছে, এবং সোভিয়েট তা প্রতিরোধ করেছে।

রুশ-জার্মান যুদ্ধ শুরুর পর ১৯৪১ সালের ৩ জুলাই প্রথম বেতার ভাষণে স্ট্যালিন এই চুক্তি প্রসঙ্গে বলেন, "অনাক্রমণ চুক্তি হল দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তি চুক্তি। ১৯৩৯ সালে এই চুক্তির প্রস্তাব জার্মানিই আমাদের দিয়েছিল। ...আমি মনে করি, প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে শান্তিচুক্তির প্রস্তাব কোনও শান্তিকামী দেশই প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, এমনকী প্রতিবেশী দেশের সরকারি ক্ষমতার শীর্ষে হিটলার ও রিবেনট্রপের মত নরখাদক শয়তান থাকলেও নয়। এক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্ত একটাই, তা হল, চুক্তি কোনমতেই প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শান্তিকামী দেশের ভৌগোলিক সংহতি, স্বাধীনতা ও সম্মানের হানি ঘটাবে না। ...সোভিয়েট জনগণ অনাক্রমণ চুক্তি এই ধরনেরই একটা চুক্তি।"

এই সোভিয়েট-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির ফলে হিটলারের মিত্ররা ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। মুসোলিনি খোলাখুলি বিরোধিতা করেন। ক্ষিপ্ত হয় জাপানও। জাপান ইতিমধ্যেই মঙ্গোলিয়ার সীমানায় সোভিয়েট ইউয়িনের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিল। জাপান হিটলারকে জানিয়ে রেখেছিল যে, আগস্ট নাগাদ সে রুশবিরোধী অভিযানে যোগ দিতে পারবে। কিন্তু এই চুক্তির ফলে জাপানের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। সবচেয়ে ক্ষিপ্ত হয় হিটলারের লন্ডনস্থ রক্ষণশীল পৃষ্ঠপোষকরা। এই প্রথম তারা হিটলারের বিরুদ্ধে গর্জন করে ওঠে। আনা লুই স্ট্রং লিখছেন, "সেই দুর্যোগের সময়, পোল্যাণ্ড যখন ভেঙে পড়ছিল, এক সোভিয়েট কূটনীতিক আমায় বললেন, 'আমরা যদি অনাক্রমণ চুক্তিটা না করতাম, আক্রমণটা আসত আমাদের উপর। ...অনাক্রমণ চুক্তি করে আমরা

হিটলার, জাপান এবং হিটলারের লণ্ডনস্থ পৃষ্ঠপোষকদের জোট ভেঙে এক থেকে অন্যকে পৃথক করে দিয়েছি।...' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হল বটে, কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়ন অনাক্রমণ চুক্তি করে দু'বছরের জন্য নিঃশ্বাস ফেলার সময় পেল।"

হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ ও সোভিয়েটের ভূমিকা

১৯৩৯-এর ১ সেপ্টেম্বর জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। দু'দিন বাদে বৃটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানির বিরুদ্ধে। কিন্তু ঐ ঘোষণা পর্যন্তই; তারা যুদ্ধ কোথাও করেনি, হিটলার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি আঙুলও তোলেনি; পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা ফ্যাসিস্ট আক্রমণ প্রতিরোধে পোল্যাণ্ডকে কোন সাহায্যই করেনি। পরবর্তীকালে ন্যুরেমবুর্গ বিচারের সময় হিটলারের হাইকমাণ্ড অপারেশন ডিপার্টমেন্ট-এর চিফ অফ স্টাফ আলফ্রেড ইয়ল স্বীকার করেন যে, "আমরা ১৯৩৯ সালেই ধ্বংস হয়ে যেতাম; তা যে হইনি, তার কারণ — যখন মাত্র ২৩ ডিভিশন সৈন্য নিয়ে আমরা পোল্যাণ্ড অভিযান করছি, তখন ফরাসি সীমান্তে বৃটেন ও ফ্রান্সের ১০০ ডিভিশন সৈন্য নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল।" (আত্মজীবনী - ঝুকভ)। শুধু তাই নয়, পোল্যাণ্ড দখলের পর থেকে নরওয়ে ও ডেনমার্ক আক্রমণের সময় পর্যন্ত (৯ এপ্রিল ১৯৪০) দীর্ঘ ৭ মাস কাল পশ্চিম সীমান্তে কোনও জোরালো লড়াই হয়নি; এই সময় জার্মান বাহিনী তাদের অধিকৃত এলাকগুলিতে ঘাঁটি শক্ত করছিল। এই ৭ মাস ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনী এবং জার্মান বাহিনী পাশাপাশি নিজ নিজ এলাকায় থেকে পরস্পরের প্রতি হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছে, এমনকী প্রীতি-ফুটবল ম্যাচ পর্যন্ত খেলেছে। স্বভাবতই নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে থাকে, তাহলে এ কেমন যুদ্ধ-ঘোষণা! নাৎসি জার্মানির 'ব্লিৎস্ক্রিগ' (ঝটিকা আক্রমণ)-এর সঙ্গে তুলনা করে এই অবস্থাকে ঠাট্টা করে জার্মানিতে বলা হয়, 'সিৎস্ক্রিগ' বা বসে থাকার যুদ্ধ। কিন্তু বৃটেনের সংবাদপত্রগুলো এই ধরনের যুদ্ধের বরং সঠিক নামকরণই করেছিল — 'ফোনি ওয়ার (নকল যুদ্ধ)'। এই নকল লড়াইয়ের আসল উদ্দেশ্য কী? এর উদ্দেশ্য, হিটলারের হাতে সোভিয়েট সীমান্তবর্তী পোল্যাণ্ডকেও উপঢৌকন দিয়ে তাদের সোভিয়েট বিরোধী আক্রমণে উৎসাহিত করা।

যাই হোক, পোল্যাণ্ডের বিভিন্ন এলাকা দখল করতে করতে জার্মান বাহিনী যখন এগিয়ে চলেছে তখন পোল সরকার তাদের দপ্তর নিয়ে রোমানিয়ার মধ্য দিয়ে বৃটেনের দিকে পালাতে থাকে। "পোল রাষ্ট্রের রাজধানী হিসাবে ওয়ারশ'র আর কোনও অস্তিত্ব নেই। পোল সরকার কোথায় আছে কেউ জানে না। পোল্যাণ্ডে সোভিয়েট ইউনিয়নের পক্ষে আশঙ্কাজনক যেকোন পরিস্থিতির উদ্ভব

হতে পারে" — এই কথাগুলো সোভিয়েট পররাষ্ট্রসচিব ভি এম মলোটভ প্রথমে পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূতকে পত্রযোগে এবং তারপর বিশ্ববাসীকে বেতারযোগে জানিয়ে দিয়ে ঘোষণা করেন যে, সোভিয়েট বাহিনী এখন পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করছে। চার্চিল তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে স্বীকার করেছেন, পোল্যান্ড সম্পর্কে সোভিয়েটের এই নীতি তৎকালীন অবস্থায় বাস্তব প্রয়োজন ও অপরিহার্য ছিল।

সেইসময় পোল্যাণ্ডের যে পূর্ব সীমান্ত ছিল, সেটা অতিক্রম করে সোভিয়েট লালফৌজ বেলোরাশিয়া, পশ্চিম ইউক্রেন ও গ্যালিসিয়া পৌঁছে যায় জার্মানবাহিনী পৌঁছানোর আগেই। এই এলাকাগুলি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েটেরই ছিল; ১৯২০ সালে পোল্যাণ্ড এগুলি দখল করে নেয়। সেকারণে ঐসব এলাকায় যখন লালফৌজ ঢোকে তখন সেখানকার জনসাধারণ তাদের উল্লাসে অভ্যর্থনা জানায়। সংবাদে প্রকাশ পায় যে, পিছু হটতে থাকা পোল সৈন্যদের সঙ্গে রুশ সৈন্যরা পাশাপাশি চলেছে;উক্রানীয় মেয়েরা রুশদের ট্যাঙ্কের উপর মালা দোলাচ্ছে। লব্‌ভ ঘাঁটির পোল সেনানায়ক কয়েকদিন ধরে তিন দিক থেকে আসা জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধ করছিলেন;চতুর্থ দিন লালফৌজ আসামাত্র তিনি তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন; বলেন, "আমাকে আদেশ দেওয়ার জন্য কোনও পোল্ সরকার আজ নেই।" (স্ট্যালিন যুগ, আনা লুই স্ট্রং)

হিটলারের পরিকল্পনা ছিল, পোল্যাণ্ড দখল করে দ্রুতগতিতে দক্ষিণ-পূর্বদিকে এগিয়ে বল্কান রাজ্যগুলোতে ঢুকে পড়া এবং তারপর উত্তর-পূর্ব দিকে বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোর যতখানি ভিতরে সম্ভব চলে যাওয়া। কিন্তু সোভিয়েট অভিযানের ফলে হিটলার বাহিনীকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে থমকে যেতে হল; তারা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি। সোভিয়েট সীমানায় পৌঁছাবার আগেই তাদের থামতে হয়েছে।

আত্মরক্ষার ঘাঁটি সাজাতে লাগল সোভিয়েট

নাৎসিবাহিনী যখন একটার পর একটা দেশ দখল করে চলে, সোভিয়েটও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিজেদের আত্মরক্ষার ঘাঁটি যতখানি সম্ভব শক্তিশালী করে চলেছে। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে এবং অক্টোবরের প্রথম দিকে এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে সোভিয়েটের সন্ধি হয় এবং তার ফলে বাল্টিক সীমান্তের এই রাষ্ট্রগুলিতে সোভিয়েট সৈন্য রাখারও ব্যবস্থা হয়। পরে এই তিন রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হবার আবেদন জানালে সোভিয়েট তা মঞ্জুর করে। এরা সোভিয়েটেরই অঙ্গ হয়ে যায়। সীমান্তবর্তী একমাত্র ফিনল্যান্ড থাকে নাৎসি জার্মানির পক্ষে। ফিনল্যান্ডে জার্মান

ইঞ্জিনিয়ারদের সহায়তায় গড়ে ওঠে বিরাট ম্যানারহাইম দুর্গশ্রেণী। ফিন বিমানবাহিনীতে বিমানসংখ্যা যা, তার দশ গুণ বিমান রাখার মতো জায়গা ছিল এই দুর্গশ্রেণীতে। বিশেষত এক জায়গায় অনেক ভারী কামান সাজানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। দুর্গের এই স্থানটা ছিল লেনিনের নামাঙ্কিত লেনিনগ্রাদ থেকে মাত্র ২১ মাইল দূরে। উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার, ভবিষ্যতে এই দুর্গশ্রেণীকে আক্রমণের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করা। সব জেনেও ফিনল্যান্ডের সীমান্তে আত্মরক্ষার এবং লেনিনগ্রাদ রক্ষার জরুরি প্রয়োজনে সোভিয়েট সরকার ফিনল্যান্ডের কাছে পারস্পরিক সহযোগিতার প্রস্তাব দেয়। লেনিনগ্রাদের কাছাকাছি কয়েকটি ফিন দ্বীপপুঞ্জ, ক্যারেলিয় যোজকের খানিকটা এবং হ্যাঙ্গো বন্দরে মাত্র ৩০ বছরের জন্য একটা সোভিয়েট বন্দর তৈরি করার অধিকারের বিনিময়ে সোভিয়েট দিতে চেয়েছিল কয়েক হাজার বর্গমাইলব্যাপী বিরাট একটি ভূখন্ড। বৃটেন ও ফ্রান্স পরামর্শ দিতে থাকে ফিন সরকারকে, তারা যেন সোভিয়েটের প্রস্তাব মেনে না নেয় এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধে ফিন-সরকারকে সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দেয় তারা। জার্মানি, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সোভিয়েটবিরোধী ষড়যন্ত্রের শরিক হয়ে ফিন-সরকার শেষপর্যন্ত সোভিয়েট-প্রস্তাবে রাজি হয়নি। অথচ জার্মান কামানের ও বিমানের পাল্লা থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে এই সীমান্ত এলাকায় সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নের কাছে জীবনমরণ প্রশ্ন। ফলে, ফিনল্যান্ডের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ফিনল্যান্ডের সাহায্যের জন্য হাজার হাজার যুদ্ধাস্ত্র, বিমান ও গাড়ি পাঠান। কিন্তু সেসব পৌঁছানোর আগেই, তিন মাস দুর্ধর্ষ লড়াই চালিয়ে লালফৌজ 'দুর্ভেদ্য' ম্যানারহাইম দুর্গশ্রেণীকে বিধ্বস্ত করে দেয়। ১৯৪০-এর ২৯ মার্চ সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পরিষদে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মলোটভ বলেন ঃ "ফিন সেনাবাহিনীকে বিধ্বস্ত করার পর সোভিয়েট ইউনিয়ন সমগ্র ফিনল্যান্ড গ্রাস করে নিতে পারত। সোভিয়েট তা তো করেইনি, এমনকী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ অন্য সবাই যেমন দাবি করে থাকে তেমন কিছু দাবিও তারা করেনি। কেবল যেটুকু না হলে নয়, সেইটুকুই সে চেয়েছে। ... আমাদের শান্তি চুক্তিতে লেনিনগ্রাদ, মুরমান্স্ক ও মুরমান্স্ক রেলপথের নিরাপত্তার ব্যবস্থাটুকু ছাড়া আর কিছুই আমরা চাইনি।"

বৃটিশ বাহিনীকে নিশ্চিত ধ্বংসের থেকে বাঁচিয়ে দেন হিটলার

১৯৪০-এর ৯ এপ্রিল জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনী নরওয়ে এবং ডেনমার্কে হানা

দেয়। যে ইঙ্গ-ফরাসি বাহিনীকে জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য নরওয়ে পাঠানো হয়েছিল তারা জার্মান আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। মে মাসে হল্যান্ড, বেলজিয়াম ও লুক্সেমবুর্গ দখলের পর যখন ফ্যাসিস্ট বাহিনী ফ্রান্স দখলে ঝাঁপ দেয়, সেখানে ডানকার্কে অবরুদ্ধ বৃটিশ বাহিনীর প্রতি হিটলারের অপ্রত্যাশিত করুণা প্রদর্শনের ঘটনায় রাজনৈতিক মহল বিস্মিত হয়েছিল। ২৯ মে থেকে ৪ জুন ডানকার্কই হতে পারত প্রায় সমগ্র বৃটিশ ও ফরাসি বাহিনীর সমাধিক্ষেত্র। কিন্তু তা হলনা। ইতিহাসের এই ঘটনা প্রথমে 'মিরাক্‌ল' হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল, পরে সত্য উদঘাটিত হয়। ফলে ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রয়োজন।

বেলজিয়াম দখল করে একটি জার্মান বাহিনী মিউজ নদী পেরিয়ে ফ্রান্সের অপেক্ষাকৃত দুর্বল স্থান সেডানের দিকে বিদ্যুৎগতিতে অভিযান চালায়। ফরাসিবাহিনীর কাছে এই অভিযান ছিল অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক। এমনই আকস্মিক যে, নদীর সেতুগুলো পর্যন্ত উড়িয়ে দেবার অবকাশ পায়নি ফরাসি বাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্যামেলাঁ। ফলে একেবারে খোলা মাঠ। উপকূলস্থ বুলাঁ ও ক্যালে বন্দর হাতছাড়া হয়ে যায়। বাকি শুধু ডানকার্ক। ফ্যাসিস্ট বাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণে বৃটিশ জেনারেল লর্ড গোর্ট ডানকার্কের দিকেই পিছিয়ে যেতে থাকেন। ডানকার্ক থেকে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে যেতে পারলেই বৃটেন ; তাহলেই রক্ষে। নইলে একজন সেনাকেও বাঁচানো যাবেনা ফ্যাসিস্ট বাহিনীর আক্রমণ থেকে।

কিন্তু বৃটেনের আড়াই লক্ষ সেনা পার হবে কী করে ? জাহাজ কোথায় ? জাহাজ এলেও ভিড়বে কোথায় ? জার্মান বোমারু বিমানের আক্রমণে গোটা বন্দরই অকেজো। ফলে কোন আশা নেই। সবাইকে মরতে হবে জ্বলন্ত ডানকার্কের মাটিতে দাঁড়িয়ে। তখনো ডানকার্ক থেকে বৃটেনে ক্ষীণ তার-যোগাযোগ আছে। খবর পেয়ে বৃটেন থেকে ক্যাপ্টেন টেন্যান্টকে পাঠানো হয় ছোট-বড় জাহাজ দিয়ে, ডানকার্ক থেকে সেনা উদ্ধারের উদ্দেশ্যে।

এদিকে জার্মান বিমানবাহিনী এবং স্থলভাগে তিন দিক থেকে ট্যাঙ্কবাহিনী অবিরাম গোলাবর্ষণ করতে করতে এগিয়ে আসছে ঝটিকা গতিতে। বেষ্টনী ছোট হয়ে আসছে ক্রমশ, মৃত্যু অনিবার্য।

কিন্তু এই সময়েই ঘটে সেই 'মিরাক্‌ল'। স্বয়ং ফুয়েরার হিটলারের আদেশ এসে পৌঁছায় জার্মান বাহিনীর কাছে — আর এগিয়ো না, কয়েকদিন বিশ্রাম নাও। জার্মান জেনারেলরা বিস্মিত ; এমন আদেশের কোনও কারণ তারা খুঁজে পায়নি। অবশেষে থেমে যায় জার্মান বাহিনী। থেমে যায় তাদের বিমান ও ট্যাঙ্ক

আক্রমণ।

দলে দলে ছোট-বড় বৃটিশ জাহাজ, লঞ্চ, বোট এসে হাজির হয় বৃটেন থেকে। ২ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৮৫ জন বৃটিশ সেনা ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে সক্ষম হয় এবং সেই সঙ্গে ১ লক্ষ ১২ হাজার ৫৪৬ জন ফরাসি সেনাও। ২৯ মে রাত থেকে ৪ জুনের মধ্যে ডানকার্ক পরিত্যক্ত হয় (সূত্র ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়)। তবে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সমর সম্ভার বলতে যা কিছু সবই হারাতে হয়েছে, কিছুই সঙ্গে আনা যায়নি। এমনকী ইউনিফর্মও শেষপর্যন্ত অনেকের গায়ে ছিল না। বেশিরভাগ সৈন্যকেই জাহাজে উঠতে হয়েছে উলঙ্গ হয়ে সাঁতার দিয়ে।

হিটলার ডানকার্কে বৃটিশ বাহিনীকে ও ফরাসি বাহিনীকে ধ্বংস করে দিলে তো সব শেষ হয়ে যায় ! হিটলার তা হতে দেননি কেন ? হিটলার কেন জার্মান বাহিনীকে থামার নির্দেশ দিয়ে বৃটিশ বাহিনীকে পালাতে সুযোগ করে দিয়েছিলেন ? এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত যুদ্ধ-বিশেষজ্ঞ লিডেলহার্ট বলেছেন, এই ঐতিহাসিক ও বিতর্কমূলক নির্দেশের পিছনে সামরিক কারণ ছিল না, আসলে ছিল রাজনৈতিক কারণ। ২৪ মে ১৯৪০ হিটলার ও নাৎসি জেনারেল রুন্ডস্টেডের মধ্যে সাক্ষাতের বিষয় সম্পর্কে রুন্ডস্টেডের রণক্রিয়ার প্রধান সেনাপতি গুয়েনথার ব্লুমেনট্রিট যুদ্ধের পর সমর-বিশেষজ্ঞ লিডেলহার্টের কাছে যা বলেছিলেন তার মর্ম হল এই ঃ "হিটলার খুব উল্লসিত ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, এই অভিযানে একটা মিরাক্‌ল ঘটে গেছে এবং যুদ্ধ ৬ সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। তারপর ফ্রান্সের সঙ্গে একটি যুক্তিসঙ্গত শান্তি-সন্ধি করার পর বৃটেনের সঙ্গে চুক্তি করারও অবাধ সুযোগ পাওয়া যাবে। এরপর হিটলার বৃটিশ সাম্রাজ্যের এমন গুণগান করেন যে, আমরা অবাক হয়ে গেলাম। তাঁর মতে, বৃটেন পৃথিবীতে একটা নতুন সভ্যতা এনেছে। ... উপসংহারে তিনি বলেন, তাঁর উদ্দেশ্য — বৃটেনের সঙ্গে একটা সম্মানজনক সন্ধি করা।" ('দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অফ দ্য থার্ড রাইখ', উইলিয়াম এল সাইরার) এবং সেটা এই কারণে যাতে সোভিয়েটবিরোধী ভয়ঙ্কর যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীকেও সামিল করা যায়।

কিন্তু এইসময় বৃটেনের সঙ্গে কোনরকম সন্ধির হিটলারি পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয়নি। এরপর হিটলার ইউরোপের আটলান্টিক উপকূল দখল করে বৃটেন আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। সেই অভিযানের নাম 'অপারেশন সী-লায়ন'। ১৯৪০-এর ৮ আগস্ট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে লন্ডন সহ বৃটেনের অন্যান্য শহরে বেপরোয়া বোমাবর্ষণ করে জার্মানি। বৃটেন তখন বিপর্যস্ত। আনা লুই স্ট্রং লিখছেন ঃ "সেবার গ্রীষ্মকালে আমি বার্লিন হয়ে মস্কো যাচ্ছিলাম ; দেখলাম —

জার্মানরা বড়াই করছে, তারা হেমন্তের প্রথমেই লন্ডন দখল করে ফেলবে। সকল দেশেরই সামরিক বিশেষজ্ঞরা এই আক্রমণের আশঙ্কা করছিলেন ;প্রায় সকলেই বলছিল যে, বৃটেনের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোটেই যথেষ্ট নয়। বৃটিশ সরকার সঞ্চিত স্বর্ণ কানাডায় পাঠিয়ে দিয়েছিল ;সংবাদপত্রের কলম-লেখকরা বৃটিশ সরকারের স্থানান্তরিত হবার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছিল।"

সোভিয়েট আক্রমণের আগে বৃটেনকে নতজানু করানোই ফ্যাসিস্ট জার্মানির সবচেয়ে বেশি কাঙ্খিত ছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্মিলিত সমরশক্তি নিয়ে তারা সোভিয়েটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল। কিন্তু ৮ আগস্ট থেকে বেপরোয়া বিমান আক্রমণ চালিয়েও বৃটেনকে সন্ধি প্রস্তাবে রাজি করানো যায়নি। ২১ অক্টোবর 'অপারেশন সী-লায়ন' বাতিল করে হিটলার সোভিয়েট সীমান্তের দিকে ঝুঁকলেন। হিটলার ব্যাখ্যা করে বলেছেন, সোভিয়েটের নীতির ফলেই বৃটেন-বিজয় অসম্ভব হয়ে পড়ল। সোভিয়েট আক্রমণের দিন ২২ জুনের বক্তৃতায় হিটলার বলেন, "১৯৪০-এর ১০ মে থেকে যখন আমাদের সেনারা পশ্চিমে ফ্রান্স ও বৃটেনের শক্তিকে ভেঙে এগিয়ে চলেছে, তখন আমাদের পূর্ব ফ্রন্টে রাশিয়ার সামরিক বিস্তার ক্রমাগত বিপজ্জনক মাত্রায় ঘটছিল...।"

বাস্তবে ঠিক তাই। ফ্রান্সের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েট সরকার তার আত্মরক্ষার ঘাঁটিগুলো অতি দ্রুত আরো মজবুত করে নেয় এবং জুনের মাঝামাঝি লালফৌজ এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ায় গিয়ে ঘাঁটি আগলে রাখে। ২৭ জুন তারা বেসারাবিয়া ও উত্তর বুকোভিসাতে অভিযান চালায়। বিপ্লবের আগে এই অঞ্চলগুলো রাশিয়ারই অংশ ছিল। বেসারাবিয়া ছিল শস্যসমৃদ্ধ অঞ্চল ;এটা সোভিয়েটের হাতে যাওয়ায় হিটলারের আর্থিক ভিত্তিতে ধাক্কা লাগে। আনা লুই স্ট্রং লিখেছেন — "এই ঘটনায় বলকান অঞ্চলের নাৎসি বিরোধী শক্তিগুলো মনে বল পায়, তারা উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। অথচ বলকান অঞ্চলের উপর হিটলারকে খাদ্য ও তেলের জন্য নির্ভর করতে হচ্ছিল। একদিকে সোভিয়েট সামরিক বিস্তার এবং অন্যদিকে জার্মান অধিকৃত বলকান এলাকাগুলিতে যে বিরুদ্ধতা মাথা তুলছিল — এ দুটো বিষয় হিটলারকে ভাবিয়ে তোলে। হিটলার দেখছিলেন, অনাক্রমণ চুক্তিকে কাজে লাগিয়ে ২২ মাসের মধ্যে সোভিয়েট তিন তিন বার জার্মানির গতিরোধ করেছে। পোল্যান্ডে সোভিয়েট অভিযানের ফলে হিটলারের পূর্বমুখী গতি এক বছরের জন্য আটকে গিয়েছে ; বেসারাবিয়ায় সোভিয়েট অভিযানের ফলে হিটলারকে বৃটেন অভিযান থেকে পিছিয়ে আসতে হয় ;আর, বল্কান ও বাল্টিক রাষ্ট্রগুলিতে মস্কোর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (অর্থাৎ

ফ্যাসিবিরোধী, গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক শক্তিগুলিকে উজ্জীবিত করা — লেখক) দার্দানালেজ-এ হিটলারকে যথেষ্ট দেরি করিয়ে দিয়েছে। হিটলার আরও দেখেন — পোল, দিনেমার, নরওয়েজিয়ান, ওলন্দাজ, বেলজিয়ান, ফরাসি, গ্রীক, যুগোশ্লাভ, বৃটিশ — ইউরোপের সমগ্র শক্তি একত্রে মিলে তাঁকে যত না বাধা দিতে পেরেছে, 'নিরপেক্ষ' সোভিয়েট ইউনিয়ন একাই তার চেয়ে বেশি বাধা দিচ্ছে।" অতএব আর দেরি নয় ; সোভিয়েট সীমান্তে সৈন্য-সমাবেশ ঘটাও। ঘোষিত হয় 'অপারেশন বার্বারোসা' — সোভিয়েট আক্রমণের ছক। এই প্রস্তুতি নিতে নিতেই জার্মান বাহিনী ১৯৪১-এর মার্চে দখল করে নেয় বুলগেরিয়া এবং এপ্রিলে যুগোশ্লাভিয়া।

এদিকে সোভিয়েটেও দ্রুত কয়েকটি ঘটনা ঘটে যায়। ৫ মে স্ট্যালিন সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন। ১৩ মে জাপানের সঙ্গে সোভিয়েটের অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মার্শাল ঝুকভ লিখছেন, "নাৎসি জার্মানির মিত্র জাপান এই চুক্তি মেনে চলবে — তার কোন গ্যারান্টি নেই। সেজন্য জার্মান বাহিনীর সঙ্গে ভয়াবহ লড়াইয়ের দিনগুলিতেও আমরা দূর প্রাচ্যে একটা ভাল সংখ্যক সেনা মোতায়েন রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম।"

বৃটেনকে ধ্বংস ও দখল করা নয়, ভয়ঙ্কর আক্রমণের চাপ সৃষ্টি করে বৃটেনকে জার্মানির শর্তে সন্ধি করানোই ছিল ফ্যাসিস্ট জার্মানির লক্ষ্য। তার লক্ষ্য — বনেদী সাম্রাজ্যবাদী দেশ বৃটেন ও ফ্রান্সকে হটিয়ে নিজে বিশ্ববাজার দখল করা ও সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণির স্থান অধিকার করা। বাজার নিয়ে দুই সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দ্বন্দ্বই ছিল যুদ্ধের কারণ। তাই সোভিয়েটের বিরুদ্ধতার প্রশ্নে সম-মনোভাব থাকলেও বৃটেনের পক্ষে জার্মানির শ্রেষ্ঠত্ব মেনে জার্মানির পক্ষে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। বিশ্ববাজারের ওপর নিজস্ব সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য ছেড়ে দিতে সে রাজি ছিল না। আবার রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানিকে সে কাজে লাগাতেও চাইছিল।

পরাস্ত করা নয়,
সোভিয়েটকে নিশ্চিহ্ন করাই ছিল হিটলারের পরিকল্পনা

সোভিয়েট সম্পর্কে কিন্তু ফ্যাসিস্টদের এই দৃষ্টিভঙ্গি নয়। সেক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ১৯৪১-এর ৩০ মার্চ জার্মান জেনারেলদের সামনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় সোভিয়েট আক্রমণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হিটলার বলেন, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ "চলবে ধ্বংসের জন্য; আমরা যদি ব্যাপারটাকে এভাবে না দেখি তাহলে শত্রুকে পুরোপুরি পরাস্ত করলেও ৩০ বছর বাদে আবার কমিউনিস্ট

বিপদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। আমরা যুদ্ধ চালাচ্ছি নিজের শত্রুকে টিনের বাক্সে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে নয়।" (এফ গল্‌ডের। সামরিক ডায়েরি, খণ্ড ২)। সোভিয়েটের বিরুদ্ধে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পরিকল্পনা ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা, এবং সোভিয়েটের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন জাতিকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের দাস বানানো, যেমন করে তারা ইতিমধ্যেই ইহুদি সহ বিভিন্ন অ-জার্মান জাতিগোষ্ঠীর লক্ষ লক্ষ মানুষকে দাসশ্রমিক হিসেবে প্রায় অনাহারে রেখে তাদের জার্মান যুদ্ধাস্ত্র কারখানায় খাটতে বাধ্য করছে। নাৎসি জেনারেলদের অপর এক অধিবেশনে হিটলার স্পষ্ট করে সেকথা জানিয়েও দেন; বলেন, — "রুশ সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করা এবং লেনিনগ্রাদ, মস্কো ও ককেসাস দখল করাই আমাদের কাছে যথেষ্ট নয়; পৃথিবীর বুক থেকে এই দেশটিকে আমাদের ধ্বংস করে দিতে হবে, তার জনগণকেও ধ্বংস করে দিতে হবে।" (ন্যুরেমবুর্গ মোকদ্দমা, খণ্ড-২)

হিটলার তাঁর সেনাপতিমণ্ডলীকে নির্দেশ দেন, "রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোন বীরধর্মের স্থান নেই। এটা মতাদর্শের যুদ্ধ, জাতিগত বৈষম্যের যুদ্ধ, এবং সেজন্যই এ যুদ্ধকে এমন নিষ্ঠুরতা ও বিরামহীন নির্মমতার সঙ্গে চালাতে হবে, যা ইতিপূর্বে কেউ দেখে নি। সমস্ত অফিসারদের তাদের পুরানো ধ্যানধারণা বিসর্জন দিতে হবে। আমি জানি, আপনারা যাঁরা সেনাধ্যক্ষ তাঁদের পক্ষে এমন পন্থায় যুদ্ধ চালানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা কঠিন। কিন্তু আমি পরিষ্কারভাবেই বলছি যে, আমার আদেশ নির্দ্বিধায় কার্যকর করতে হবে। ...রুশ কমিশাররা এমন একটি আদর্শের বাহক যা জাতীয় সমাজতন্ত্রের (নাৎসিবাদের) সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে। সুতরাং এই কমিশারদের একেবারে শেষ করে দিতে হবে। যেসব জার্মান সেনারা আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে অপরাধী হবে — তাদের ক্ষমা করে দেওয়া হবে।" (এ ডিক্সনারী অফ ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স, হিয়ামসন, লণ্ডন, ১৯৪৬) হিটলার আরও বলেন, "জার্মান জনগণের নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই আমাদের এই অভিযান। এর অঙ্গ হিসেবে এই দেশটির সমগ্র জনসমষ্টিকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে। নিশ্চিহ্নকরণের কলাকৌশল আমাদের আরও উন্নত করতে হবে।" (দ্য সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, ডেবোরিন, মস্কো, ১৯৬৪)।

সোভিয়েটের শহরগুলো ধ্বংসেরও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। জার্মান জেনারেল স্টাফের একটি সরকারি দলিলে বলা হয়েছে, "ফুয়েরার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পিটার্সবুর্গ (লেনিনগ্রাদ) শহরকে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। রাশিয়ার পরাজয়ের পর এই ঘনবসতিপূর্ণ নগরীকে জিইয়ে রাখার আর কোন প্রয়োজন হবে না।"

জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর মধ্যে এমনভাবেই কমিউনিস্ট বিদ্বেষ এবং বিশেষ করে সোভিয়েট বিদ্বেষ প্রথম থেকে সংক্রামিত করা হয়। নির্মমভাবে জার্মান কমিউনিস্টদের হত্যা করেই হিটলার ক্ষমতায় বসে। সুপরিকল্পিতভাবে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে জার্মান জনসাধারণের একটা বড় অংশের মগজ ধোলাই করে সোভিয়েট বিদ্বেষের বিষ তীব্রভাবে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে অন্যান্য দেশ দখলের ক্ষেত্রে ফ্যাসিস্টরা কেবল সাম্রাজ্যবাদী হানাদারি চালালেও সোভিয়েটের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধের প্রস্তুতি ছিল ভাবাদর্শগত দিক থেকেও। নাৎসি উত্থানের প্রথম দিনটি থেকেই নাৎসিরা সাধারণ জার্মান জনগণকে বুঝিয়েছে যে, জার্মানরা খাঁটি আর্যবংশ জাত এবং সেজন্য বিশ্বশ্রেষ্ঠ জাতি। অতএব বিশ্বের যাবতীয় সম্পদ কেবল জার্মানদেরই ভোগের অধিকার। অন্য সমস্ত জাতি জার্মানদের দাস হিসেবেই বাঁচবে, নইলে তাদের বেঁচে থাকবারও অধিকার নেই। নাৎসি বাহিনীর এই মতাদর্শ দ্বারা জার্মান জনগণ যথেষ্ট প্রভাবিতও হয়। ১৯৪৫-এর ১৩ জুন 'ডাই ফোক্স জাইটুং' সংবাদপত্রে প্রকাশিত জার্মান কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক প্রচারিত একটি আবেদনপত্র থেকে জানা যায়, "...বহু লক্ষ জার্মান জনগণ নাৎসি বাগাড়ম্বরের বেড়াজালে বন্দি হয়ে পড়েছিল; পাশবিক জাতি-তত্ত্ব, 'জীবনের জন্য সংগ্রামের' তত্ত্বের বিষ জনগণের মনপ্রাণকে বিষাক্ত করে দিয়েছিল। ...ব্যাপক জনসাধারণ তাদের সাধারণ সততা ও ন্যায়বোধ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল এবং হিটলার যখন তাদের প্রতিশ্রুতি দিল যে, যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের দ্বারা অন্যান্য জাতির মুখের অন্ন কেড়ে এনে তাদের উদরপূর্তি করা হবে, তখন তারা তাকে অন্ধের মত অনুসরণ করেছিল।" (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস — ভিক্টর মাৎসুলেনকো)। এই তীব্র জাতি-বিদ্বেষ ও ঘৃণার সঙ্গে কমিউনিস্ট বিদ্বেষকে যুক্ত করে প্রচার করা হয়েছিল যে, কমিউনিস্টরা বিশ্বসভ্যতার ঘৃণ্য শত্রু, এদের বেঁচে থাকবারও অধিকার নেই; এদের সমূলে ধ্বংস করতে হবে, হত্যা করতে হবে।

কমিউনিস্ট মতাদর্শভিত্তিক নতুন সভ্যতা সোভিয়েট সমাজতন্ত্রকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা নিয়ে জার্মান ফ্যাসিস্ট ঝটিকা বাহিনী সোভিয়েট সীমান্তে প্রস্তুত হয় ঝাঁপিয়ে পড়ার লক্ষ্যে। ইতিমধ্যে ১৯৪১ সালের প্রথমার্ধে, অর্থাৎ আক্রমণ শুরু করার ঠিক আগের ছ-মাসে সোভিয়েটের পশ্চিম সীমান্তের আকাশসীমা তারা ৩২৪ বার লঙ্ঘন করে উস্কানি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে, যাতে সোভিয়েট নেতৃত্ব ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে আগে আক্রমণ করে বসে। তাহলে, সোভিয়েটই আক্রমণকারী এবং তারাই আগে জার্মানদের আক্রমণ করেছে বলে বিশ্বময় প্রচার চালিয়ে সোভিয়েট আক্রমণের একটা যুৎসই অজুহাত দেখানো যাবে। কিন্তু সোভিয়েট সেই প্ররোচনার ফাঁদে পা দেয়নি। যুদ্ধপূর্ব ১১ মাসের মধ্যে

সোভিয়েট সীমান্তরক্ষীরা প্রায় পাঁচ হাজার জার্মান গুপ্তচরকে আটক করেছিল; তবু সীমান্তের জার্মান সেনাবাহিনীর উপর সোভিয়েট কোন আক্রমণ চালায়নি।

সংঘবদ্ধ প্রতিবিপ্লবী ইউরোপ সর্বশক্তি নিয়ে সোভিয়েট সীমান্তে

বৃটেন বাদে প্রায় সমগ্র ইউরোপ তখন জার্মান বাহিনীর করতলগত। তারা যেসব দেশ দখল করেছিল, তাদের সমগ্র অর্থনীতিকেও জার্মান সমরাস্ত্র নির্মাণের কাজে লাগানো হয়েছিল। পরাজিত দেশগুলির সমগ্র অর্থনীতি, তাদের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জ্বালানি তেল, ইস্পাত-কয়লা-খাদ্য-কাঁচামাল সবকিছুই তখন জার্মান বাহিনী যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করেছিল। এছাড়া ছিল তাদের সুদৃঢ় ফ্যাসিস্ট জোট, যাতে জার্মানি ছাড়াও অন্তর্ভুক্ত ছিল জাপান, ইতালি, ফিনল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি ও রোমানিয়া। জাপান ছাড়া সব রাষ্ট্রই তাদের সেরা বাহিনী নিয়ে অবস্থান করছিল সোভিয়েট সীমান্তে। আফ্রিকা থেকে জার্মান সেনাপতি রোমেল তার বাহিনী নিয়ে যোগ দিলেন। এই জোটবাহিনীকে সাহায্য করতে ফ্রান্স ও স্পেন থেকে এসেছিল অভিযাত্রী ফ্যাসিস্ট দল। পশ্চিমে লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এই বিশাল বাহিনী জার্মান হাইকমান্ডের আদেশের অপেক্ষা করছিল, যাতে আদেশ পাওয়ামাত্র তারা সোভিয়েটের সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলির উপর আকস্মিক আঘাত হেনে দ্রুত দখল করে নিতে পারে। ১৯৪০-এর ১৮ ডিসেম্বর হিটলার সোভিয়েটবিরোধী অভিযানের জন্য যে ২১ নং নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করেন তা 'বার্বারোসা' পরিকল্পনা নামে খ্যাত। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন। হিটলার হিসেব করে নিয়েছিলেন যে, ১৯৪১-এর ২২ জুন শুরু হবে ঝটিকা আক্রমণ; সেই ভয়ঙ্কর আক্রমণের সাহায্যে ১ অক্টোবরের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ মাস তিনেকের মধ্যে সোভিয়েট ইউনিয়নকে খতম করে দেওয়া যাবে। (সূত্র ঃ কে রেইনগার্ডট। মস্কোর উপকণ্ঠে পট-পরিবর্তন)।

সোভিয়েট আক্রান্ত

১৯৪১-এর ২২ জুন, রাত ৪টে। ২২ মাস আগে সোভিয়েট ও জার্মানির মধ্যে সম্পাদিত ১০ বছরের অনাক্রমণ চুক্তিকে পদদলিত করে হিটলারের ১৭০ ডিভিশনের বিশাল ঝটিকা বাহিনী দু-হাজার মাইল দীর্ঘ সোভিয়েট-সীমান্ত জুড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি দীর্ঘতম রণক্ষেত্র। ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলে দেখলে কলকাতা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত একটাই ফ্রন্ট এবং সর্বত্র একসঙ্গে

আক্রমণ। উত্তরে — ফিনল্যাণ্ড থেকে লেনিনগ্রাদ ও উত্তর মেরুবন্দর মুরমান্স্কের দিকে, মধ্যভাগে — পোল্যাণ্ড থেকে রাজধানী মস্কোর দিকে। দক্ষিণে — রোমানিয়া থেকে কিয়েভ ও ওডেসার দিকে। ত্রিশূলের ফলার মত আক্রমণ শুরু হয়। হাজার হাজার বিমান বোমা বর্ষণ করতে করতে উড়ে চলল এবং হাজার হাজার ট্যাঙ্ক সীমান্ত বিধ্বস্ত করে এগিয়ে চলল; তাদের পিছনে মোটরবাহিত লক্ষ লক্ষ সেনা। হিটলার দাবি করলেন, ইতিহাসে এতবড় সামরিক অভিযান আর কখনও হয়নি। হিটলার নির্দেশ জারি করলেন — এক সপ্তাহের মধ্যে কিয়েভ ও স্মোলেন্স্ক দখল কর, এবং এক মাসের মধ্যে মস্কো এবং লেনিনগ্রাদ।

সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করার চার ঘণ্টা পর ঐ ২২ জুনেই জার্মান জনগণের উদ্দেশে হিটলারের ঘোষণা বেতার মারফৎ পাঠ করে শোনানো হয়। এই ঘোষণায় হিটলার যথারীতি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন যে, জার্মানি কখনো রাশিয়ার বিরুদ্ধে শত্রুতার মনোভাব পোষণ করেনি। তবু গত ২০ বছরেরও বেশি সময় ধরে মস্কোর 'বলশেভিক ইহুদি' শাসকেরা কেবল জার্মানিতে নয়, সারা ইউরোপে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করেছে। তারা কেবল তাদের মতবাদই চাপিয়ে দিতে চেয়েছে তাই নয়, সামরিক বলপ্রয়োগের দ্বারা ইউরোপীয় জনগণের উপর প্রভুত্ব কায়েম করতে চেয়েছে। ...বৃটেন ও রাশিয়া পারস্পরিক যোগসাজস ও চক্রান্তের দ্বারা জার্মানি ও ইউরোপকে বিপন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছিল।

এইসব অভিযোগ শেষে উপসংহারে হিটলার বলেন, 'হে জার্মান জনগণ, এই মুহূর্তে এমন একটা অভিযান চলছে, শক্তির দিক থেকে তুলনা করলে এতবড় অভিযান ইতিপূর্বে পৃথিবীতে ঘটেনি। তারপর বললেন, বিশেষ কোন দেশকে রক্ষা করা এই রণাঙ্গনে আমাদের উদ্দেশ্য নয়; সমগ্র ইউরোপের নিরাপত্তা এবং সকলের মুক্তিই আমাদের লক্ষ্য। সুতরাং জার্মান রাষ্ট্র এবং আমাদের জনগণের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ আমি আজ আবার আমাদের সৈন্যদলের হাতে তুলে দেবার সিদ্ধান্ত করেছি। এই বৃহত্তম সংগ্রামে ভগবান আমাদের সহায় হোন।'

সুতরাং হিটলারের বক্তব্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েটকে চূর্ণ করে 'ইউরোপ রক্ষার' স্বঘোষিত মহান ব্রত তিনি গ্রহণ করেছেন এবং সেই জন্য তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে সোভিয়েট ধ্বংসের হুকুম দিয়েছেন।

সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মলোটভ তাঁর বেতার ভাষণে জার্মান ফ্যাসিস্ট

শাসকরা অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন করে অতর্কিতে কীভাবে সোভিয়েট আক্রমণ করে বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিয়েছে — তা তুলে ধরেন। প্রতিরোধ সংগ্রামের দ্বারা ফ্যাসিস্ট আক্রমণের জবাব দেবার আহ্বান তিনি জানান।

কিন্তু সোভিয়েট প্রতিরোধ সত্ত্বেও আকস্মিক প্রথম আক্রমণে আক্রমণকারী স্বাভাবিকভাবে যে সুবিধা পেয়ে থাকে, জার্মানবাহিনী সেই সুবিধা পেতে থাকে। ধ্বংসোন্মত্ত ফ্যাসিস্ট সৈন্যদল প্রবল বন্যার মতো সোভিয়েট সীমান্তের সমস্ত আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এগুতে শুরু করে। নিদারুণ বোমাবর্ষণে সোভিয়েটের প্রচুর বিমান, বিমানশালা, বিমান ময়দান, রেলপথ, ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রাগার ধূলিসাৎ হয়ে যায়। ২২ জুন থেকে ২৯ জুন — এই এক সপ্তাহ যুদ্ধের শেষে জার্মানপক্ষ সামরিক জয়োল্লাসপূর্ণ এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। বাল্টিক তীরবর্তী লিথুয়ানিয়া দখল হয়ে যায়। লাটভিয়ার প্রধান বন্দর রিগা আক্রান্ত। মিনস্কের দিকেও প্রবল জয়ের সম্ভাবনা। দক্ষিণ পোল্যাণ্ডের প্রিজমিজেল দু'বার হাতবদলের পর জার্মান অধিকারে চলে যায়। লুক এবং লোও দু'বার হাতবদল হয় এবং সেখানে শত শত ট্যাঙ্কের সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। রোমানিয়া সীমান্তে সেরনোভিৎস দখল হয়ে যায়; প্রুথ নদী অতিক্রম করে রোমানিয় সৈন্যেরা আরও দক্ষিণে বোলগ্রাদ শহর দখল করে নেয়। ফিনিশ সৈন্যেরা হ্যাঙ্গো বন্দর বোমাবিধ্বস্ত করে ও আলাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ দখল করে নেয়।

সোভিয়েট-জার্মান যুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির বৃহৎ পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী মহলের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, 'সোভিয়েট ইউনিয়ন ও নাৎসি জার্মানির মধ্যেকার যুদ্ধ কেবল তাদের নিজেদেরই (পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলিরই) স্বার্থের অনুকূল হবে। তারা বলত যে, রাশিয়া অবশ্যই পরাস্ত হবে এবং তার ফলে কমিউনিজম বিলুপ্ত হবে, আর এই সংঘর্ষের ফলে জার্মানি সুদীর্ঘ বছরের জন্য হীনবল হয়ে পড়বে এবং বাদবাকি দুনিয়ার পক্ষে তারা আর বাস্তব কোন বিপদ সৃষ্টি করতে পারবেনা। (ওয়েলস্ এস দ্য টাইমস ফর ডিসিশন, নিউইয়র্ক, লণ্ডন, ১৯৪৪)

আমেরিকায় সোভিয়েট সম্পর্কে বিদ্বেষমূলক প্রচার

আমেরিকা তখন উঠতি সাম্রাজ্যবাদের স্তরে, বৃটেনের মতে বনেদী সাম্রাজ্যবাদী নয়, যদিও তখন বৃটেনের অবস্থা পতনোন্মুখ। আমেরিকায় ১৯১৮ সাল থেকেই সোভিয়েটবিরোধী প্রচার ক্রমাগত জোরদার করা হচ্ছিল। পরবর্তীকালে ফ্যাসিস্টদের উদ্যোগে সেখানে সোভিয়েটবিরোধী প্রচার ও চক্রান্তের মজবুত ঘাঁটি গড়ে ওঠে। ১৯৩৯ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৭৫০টি

ফ্যাসিস্ট প্রতিষ্ঠান রাশি রাশি বুলেটিন, পত্রিকা, সংবাদপত্র ও ইশতেহারে দেশ ছেয়ে ফেলেছিল। তাই নাৎসি জার্মানি সোভিয়েটকে আক্রমণ করার সাথে সাথে চারিদিক থেকে ভবিষ্যৎবাণী হতে থাকে যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রের পরমায়ু প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। মার্কিন কংগ্রেস সদস্য মার্টিন ডাইস (২৪ জুন, ১৯৪১) ঘোষণা করেন, 'তিরিশ দিনের মধ্যেই রাশিয়া হিটলারের আয়ত্তে এসে যাবে।' নিউ ইয়র্ক জার্নাল আমেরিকান (২৭ জুন ১৯৪১) লেখে, 'রাশিয়ার দিন শেষ হয়ে এসেছে। বৃটেন বা আমেরিকা কেউ নাৎসিবাহিনীর তড়িৎগতি ধ্বংসাভিযান প্রতিরোধ করতে পারবে না।' পরে (৩০ মার্চ ১৯৪২) আরও লেখে, 'আপনারা জানেন, রাশিয়ার কাছ থেকে বিশেষ কিছু আমরা আশা করতে পারিনা। ভাল্লুক মানুষের মতো হাঁটে বলেই মানুষের মত চিন্তা করবে — সব সময়ে এ আশা করা চলে না। রুশদের মানসিক প্রকৃতিতে এমন একটা পাশবিক স্বার্থপরতা ও বেইমানির প্রবণতা আছে যা ওদের 'প্রতীক' ঐ বন্য জানোয়ারটারই (ভাল্লুকেরই) স্বভাবগত।' নিউ ইয়র্ক টাইমস (২৯ জুন ১৯৪১) লেখে, 'স্বদক্ষতায়, নেতৃত্বে, শিক্ষায়, সমরসজ্জায় কোন দিক দিয়েই জার্মানদের সঙ্গে রুশদের তুলনা চলে না; কোথায় কাইটেল, ব্রাউচিটস্ — আর কোথায় টিমোশেঙ্কো, বুদেনি। বলশেভিক শোষণ ও কড়া শাসনের চাপে লালফৌজ ঝরঝরে হয়ে গেছে।' তীব্র সোভিয়েট বিরোধী প্রচার চালিয়ে সিকাগো ট্রিবিউন (২৪ আগস্ট ১৯৪৩) লেখে, 'স্ট্যালিন তাঁর তথাকথিত বন্ধুদের থেকে যা পেতে পারেন, তার চেয়ে যদি জার্মানির থেকে অল্প আয়াসে অনেক বেশি জিনিস আদায় করতে পারেন, তাহলে এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা এই স্বার্থসর্বস্ব স্বভাব-জোচ্চোরের পক্ষে বেছে নেওয়ার স্বাভাবিক? সারাটা জীবন ধরে ক্রেমলিনের এই জর্জিয়ানটির যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তা হল নির্বিকার স্বার্থপরতা। এই লোভ আর স্বার্থপরতা স্ট্যালিনের স্বভাবসিদ্ধ।' ১৯৪১ সালে মার্কিন সিনেটর (পরবর্তীকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট) হ্যারি ট্রুমান মার্কিন সরকারের উদ্দেশে বলেন, "জার্মানরা জিততে থাকলে আমাদের উচিত রুশদের সাহায্য করা, আর রুশরা জিততে থাকলে আমাদের উচিত জার্মানদের সাহায্য করা; এইভাবে ওরা যত পারে লোক খুন করুক" (নিউ ইয়র্ক টাইমস্ ২৪ জুন, ১৯৪১)। অর্থাৎ পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের এই পরিকল্পনা, স্ট্যালিনের ভাষায় —"ওরা পরস্পরকে দুর্বল করুক, ধ্বংস করুক; যখন ওরা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়বে তখন তাঁরা (পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা) মঞ্চে অবতীর্ণ হবে পূর্ণশক্তি নিয়ে — অবশ্যই 'শান্তির স্বার্থে' এবং যুদ্ধ চালিয়ে দুর্বল হয়ে পড়া রাষ্ট্রগুলির উপর শর্ত চাপাবে। কী সস্তা ও সহজ!" (সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসের ভাষণ)

প্রাথমিক আচমকা আক্রমণে হিটলারের ফ্যাসিস্ট বাহিনী সোভিয়েটের প্রতিরোধ ভেঙে দ্রুত ভিতরে ঢুকে যায়। শত্রুরা সোভিয়েটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো দখল করে নেয় এবং বেশ কিছু সামরিক জেলায় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অচল করে দেয়। লক্ষ লক্ষ সোভিয়েট জনগণ এবং বিপুল পরিমাণ সম্পদ জার্মান বাহিনীর দখলে চলে যায়।

অনাক্রমণ চুক্তি সম্পর্কে স্ট্যালিনের কোন মোহ ছিল না

কেন এটা ঘটতে পারল? স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর অনেকে এর ব্যাখ্যা হিসেবে বলেন যে, সোভিয়েট সরকার বিশেষত তার কর্ণধার স্ট্যালিন ১৯৩৯ সালের 'জার্মান-সোভিয়েট অনাক্রমণ চুক্তি'র উপর অগাধ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং সেজন্য সম্ভাব্য জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলেন নি। তাই আচমকা জার্মান আক্রমণে 'অসতর্ক রাশিয়ার বিহ্বলতা'ই নাকি প্রকট হয়ে উঠেছিল। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট সরকারের নেতৃত্বে আসীন সংশোধনবাদী ক্রুশ্চেভ-চক্র স্ট্যালিন নেতৃত্বকে মসীলিপ্ত করতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্ট্যালিনের ভূমিকা সম্পর্কে বিতর্ক তুলে দেয়।

এইসব অভিযোগকে মিথ্যা এবং ভ্রান্ত বলে অভিহিত করেছেন তৎকালীন সোভিয়েট মার্শাল ঝুকভ। তাঁর আত্মজীবনীতে (১৯৭৪) এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "১৯৩৯ সালে জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল এমন একটা সময়ে যখন আমাদের দেশ জার্মানি ও জাপান —দুদিক থেকেই আক্রান্ত হতে পারত; এটা ভাবার কোন কারণ নেই যে, এই চুক্তি সম্পর্কে স্ট্যালিনের কোনপ্রকার মোহ ছিল। এই চুক্তির ফলে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসন থেকে সোভিয়েট ইউনিয়ন যে রেহাই পাবে না — সে সম্পর্কে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েট সরকার সচেতন ছিল এবং সেই কারণে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবার জন্য (এই অনাক্রমণ চুক্তির মাধ্যমে) আরও কিছুটা সময় আদায় করে নেওয়া হয়েছিল। সর্বোপরি, সোভিয়েট বিরোধী ফ্রন্টের ঐক্যবদ্ধভাবে মাথা তোলার সম্ভাবনাকে এই চুক্তি আটকে দিয়েছিল। অনাক্রমণ চুক্তি প্রসঙ্গে নিশ্চিন্ততাজ্ঞাপক কোন মতামত আমি স্ট্যালিনের মুখে কখনো শুনিনি।"

ঝুকভ আরও লেখেন, "১৯৩৯ থেকে ১৯৪১-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত জনগণ এবং পার্টি দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

"আমাদের অগ্রসর শিল্প, যৌথখামার ব্যবস্থা, সার্বজনীন সাক্ষরতা, জাতিগত

ঐক্য, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নৈতিক শক্তি, জনগণের মহান দেশপ্রেম, পার্টির লেনিনীয় নেতৃত্ব — এই সবগুলিকে রণক্ষেত্র ও তার পশ্চাদ্‌ভূমির সঙ্গে যুক্ত করেই গড়ে উঠেছিল দেশের ব্যাপক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার শক্তিশালী বুনিয়াদ এবং সেটাই ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধে সোভিয়েটের মহান বিজয়ের মূল উৎস। ...১৯৩৯ থেকে ১৯৪১-এর মাঝামাঝি সময়টি একটি সামগ্রিক রূপান্তর হিসাবে চিহ্নিত ছিল; সে সময়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন একটি প্রতিভাসম্পন্ন সেনাবাহিনীকে আরও মজবুত করেছিল এবং যা ছিল দেশরক্ষার জন্য দারুণভাবে প্রস্তুত।"

তিনি লেখেন, "যা হওয়া উচিত, প্রত্যেকটি জিনিস তেমনভাবে সংগঠিত করবার জন্য শান্তিকালীন যে সময়ের প্রয়োজন — ইতিহাস তা আমাদের দেয়নি। আমরা অনেক জিনিস ঠিকমত শুরু করেছিলাম, কিন্তু অনেক জিনিস সম্পূর্ণ করবার মত সময় আমরা পাইনি। ...এই দিকগুলিকে সমগ্র যুদ্ধকালব্যাপী নিরন্তর আরও ব্যাপক এবং আরও শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে। এবং সেগুলোই শেষপর্যন্ত বিজয় এনে দিয়েছে।"

তিনি লেখেন, "দেশের প্রতিরক্ষাকে সুদৃঢ় করতে পার্টি ও সরকার ১৯৪০ সালে কিছু অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যে সেই পদক্ষেপগুলিকে পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী করবার মতো প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আমাদের ছিলনা। সশস্ত্র বাহিনীর পুনর্গঠন, দক্ষতাবৃদ্ধি ও পুনর্প্রশিক্ষণের কাজ এবং প্রয়োজনীয় যুদ্ধ প্রস্তুতি ও রাষ্ট্রীয় রিজার্ভ গঠন প্রক্রিয়া চলতে চলতেই (অর্থাৎ প্রস্তুতি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই) আমাদের দেশের উপর যুদ্ধ চেপে বসে।"

জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধের প্রস্তুতি যতদূর সম্ভব চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে কতটা সময় পাওয়া যাবে — সেটাই ছিল সোভিয়েট নেতৃত্বের বিচার্য বিষয় এবং সেজন্যই অনাক্রমণ চুক্তির ফলে কিছুটা সময় যে পাওয়া গিয়েছিল — সেকথা কমরেড স্ট্যালিন ১৯৪১ সালে তাঁর প্রথম বেতার ভাষণে বলেছেন। মার্শাল ঝুকভও সেটাই বলেছেন। তা না হলে প্রায় দু-বছর আগেই সোভিয়েটকে ফ্যাসিস্ট আক্রমণের সামনে পড়তে হত। ঝুকভ লিখছেন, "কাছাকাছি থাকা লোকজনদের সঙ্গে স্ট্যালিন আমার সামনে যেসব কথাবার্তা বলেছেন, সেগুলি তুলনা ও বিশ্লেষণ করে আমি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছি যে, তাঁর সমগ্র চিন্তায় ও কাজে যুদ্ধকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হত...। নাৎসি জার্মানির মতো একটি শক্তিশালী ও ধূর্ত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে তা সোভিয়েট জনগণের উপর যে কী দুর্ভাগ্যের বোঝা চাপিয়ে দেবে — স্ট্যালিন তা খুব ভাল করেই জানতেন। তাই, প্রস্তুতির প্রয়োজনে যতটা বেশি সময় পাওয়া যায়,

সেজন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের সমগ্র পার্টিও তাই করেছিল।" তাই, জার্মান বিমান ৩২৪ বার সোভিয়েট সীমানায় ঢুকে প্ররোচনা সৃষ্টির চেষ্টা করা সত্ত্বেও সোভিয়েট নেতৃত্ব জার্মানির উপর আগাম আক্রমণ হেনে বসেনি।

জার্মান বাহিনী সোভিয়েটের এত ভিতরে ঢুকতে পারল কী করে

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর অনেকে এমন প্রশ্নও তুলেছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন নাৎসি বাহিনীকে রাশিয়ার মাটিতে এতদূর ঢুকতে দিল কেন? নাৎসিরা যখন গ্রীস দখল করেছিল, যখন তারা সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতই ছিল না, তখনই আগেভাগে লালফৌজ যদি তাদের আক্রমণ করত, তাহলে তো নাৎসিরা সেখানেই ঘায়েল হয়ে যেত। তা করা হল না কেন?

৩ জুলাই স্ট্যালিনের বেতার ভাষণে এর জবাব পাওয়া যায়। তিনি বলেছিলেন, "১৯৩৯ সালে সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে জার্মানি যে অনাক্রমণ চুক্তি করেছিল, অত্যন্ত আকস্মিকভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করে সেই চুক্তি তারা লঙ্ঘন করেছে। ...আমাদের দেশ শান্তি চায়, চুক্তি লঙ্ঘনে আমরা অগ্রণী হতে চাইনি, বিশ্বাসঘাতকতার পক্ষে যাইনি।... বিশ্বাসঘাতকের মত চুক্তি ছিঁড়ে ফেলে সোভিয়েট ইউনিয়নে হানাদারি চালিয়ে ফ্যাসিস্ট জার্মানি কী লাভ করেছে এবং ক্ষতিই বা তার কী হয়েছে? এর দ্বারা সুবিধাজনক জায়গায় নিজের সৈন্য সমাবেশের সুযোগ অল্প সময়ের জন্য জার্মানি পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু গোটা দুনিয়ার চোখে নিজের রক্তপিপাসু হানাদার চরিত্র উদঘাটিত করে দিয়ে রাজনৈতিকভাবে জার্মানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সামরিক দিক থেকে জার্মানির লাভটুকু নেহাতই একটা ক্ষণস্থায়ী ঘটনা। অন্যদিকে যে প্রবল রাজনৈতিক লাভ সোভিয়েট ইউনিয়নের হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী, যেটা ফ্যাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে আগামী দিনে লালফৌজের সামরিক বিজয়ের জমি তৈরি করে দেবে।" পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে দিয়েছে, স্ট্যালিনের এই বক্তব্য কত যুক্তিযুক্ত ও নির্ভুল ছিল।

এ প্রসঙ্গে বৃটিশ লেখক প্যাট স্লোয়ান তাঁর 'রাশিয়া রেজিস্ট্স' গ্রন্থে লিখেছেন, "প্রথমত, সমগ্র দুনিয়ার কাছে সোভিয়েট তার শান্তিমুখী ইচ্ছেটাকে প্রমাণ করেছে। দ্বিতীয়ত, লালফৌজ আগেই জার্মানিকে আক্রমণ করলে যা পরিস্থিতি হত, তার চেয়ে এখন জার্মানির অভ্যন্তরেই হিটলারের অবস্থান আরও দুর্বল হয়ে গিয়েছে।... তৃতীয়ত, লালফৌজ যদি আগেভাগে নাৎসি অধিকৃত এলাকা দখল করে নিত, তাহলে, 'বলশেভিকবাদের বিপদের' বিরুদ্ধে হিটলার

নিজেকে ইউরোপের 'ত্রাতা' হিসেবে তুলে ধরার সুবিধা পেয়ে যেত। তখন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল একথা ঘোষণা করতে পারত না যে, 'আমি দেখছি রুশ সৈন্যরা তাদের মাতৃভূমির দরজায় দাঁড়িয়ে স্মরণাতীতকাল থেকে তাদের পিতৃপুরুষদের কর্ষণ করা ভূমি রক্ষা করছে।' সোভিয়েট আক্রমণ করলে তখন বরং নাৎসিবাদের পৃষ্ঠপোষকেরা বিশ্বময় প্রচার করত যে, 'বলশেভিকরা হানাদার এবং সেই হানাদারির বিরুদ্ধে পোল্যাণ্ড, জার্মানি, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া তাদের মাতৃভূমি রক্ষায় লড়ছে।"

"সোভিয়েট সম্পর্কে মিথ্যা ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে জার্মানির রক্ষাকর্তা হিসেবে সে দেশের জনমনে হিটলার নিজের একটা ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিল; সোভিয়েট ইউনিয়ন নিজের উপর জার্মান বাহিনীকে প্রথম আঘাত হানতে দিয়ে জার্মানির অভ্যন্তরে হিটলারের তৈরি করা সেই জনপ্রিয় ভাবমূর্তিতে ফাটল ধরিয়ে দেয়। বৃটিশ এবং মার্কিন সরকারও তখন শত্রুতার পরিবর্তে সোভিয়েটের প্রতি সমর্থন জানাতে বাধ্য হয়। সেইসঙ্গে বিশ্বের দেশে দেশে কোটি কোটি জনগণ সমর্থন ও সহানুভূতি নিয়ে সোভিয়েটের পাশে দাঁড়িয়ে যায়। এইভাবে সোভিয়েট তার আপাত সামরিক ক্ষতির বিনিময়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন করেছিল।"

"সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সুচিন্তিত নীতিকে ধরতে না পেরে নাৎসি শাসকরা সম্ভবত লালফৌজের বর্তমান ক্ষমতা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেছিল। তারা হয়ত এমনও ভেবেছিল যে, নাৎসিবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে সফলতা অর্জনের ক্ষমতা সোভিয়েট সরকারের নেই। যেকোন মূল্যে দ্রুত বিজয় অর্জনের আশা নিয়েই তারা সোভিয়েটকে আক্রমণ করেছিল।"

সোভিয়েটে জার্মান-দোসর পাওয়া যায়নি

হিটলারের জার্মান বাহিনী যখন ইউরোপের দেশগুলি দখল করতে করতে এগিয়েছে, তখন দেখা গেছে, বহু দেশেই জার্মানি নাৎসি-দোসর পেয়ে যাচ্ছে, যারা স্বদেশের বিরুদ্ধে হিটলারের পক্ষ নিয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ ঘটনা অনেককেই বিস্মিত করে দেয়। আসলে, হিটলারের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতিটি দেশে গোপনে গড়ে তোলা হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকদের ঘাঁটি। যাদের বলা হত পঞ্চমবাহিনী। এক এক দেশে এদের এক এক নাম। বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন দেহ হলেও এদের প্রত্যেকের হৃদস্পন্দন নাৎসি জার্মানির সঙ্গে জড়িত ছিল। এরা বিকৃত ফ্যাসিস্ট চিন্তায় দীক্ষিত, হিটলারের অন্ধ অনুগত, হিটলারের অর্থে পুষ্ট। এদের কাজ, নিজ নিজ দেশের সামরিক বাহিনীর কর্তা, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি,

সামরিক উৎপাদনের কর্তা ইত্যাদিদের ঘুষ দিয়ে হিটলারের পক্ষে নিয়ে আসা; যাদেরকে বশীভূত করা সম্ভব নয় তাদের হত্যা করা; সে দেশের কলকারখানা ও যুদ্ধোপকরণ নির্মাণ শিল্পকে ভিতর থেকে অন্তর্ঘাত চালিয়ে পঙ্গু ও অচল করে দেওয়া; এরপর হিটলারের ঝটিকাবাহিনী যখন সেইসব দেশে ঢুকেছে তখন অনায়াসেই জয়লাভ ঘটেছে। রাশিয়াতেও তেমন পঞ্চমবাহিনী গড়ে উঠেছিল, ডালপালাও বিস্তার করেছিল। লালফৌজের জেনারেল থেকে কয়েকজন পদস্থ অফিসার, রুশ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কয়েকজন সদস্য পর্যন্ত এই পঞ্চমবাহিনীর মধ্যে ছিল। এছাড়াও নিচের স্তরে নানান সমরাস্ত্র শিল্পের ম্যানেজার থেকে আরও নিচের স্তর পর্যন্ত পঞ্চম বাহিনীর চক্রান্তের জাল ছড়ানো হয়েছিল। তারা অসংখ্য গুপ্তহত্যা ও অন্তর্ঘাত চালিয়েছে; দলের প্রথম সারির নেতা লেনিনগ্রাদ পার্টি সেক্রেটারি কিরভ, বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কীসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে তারা হত্যা করেছে। স্ট্যালিন, ঝুকভ, ভরোসিলভ সহ সোভিয়েট নেতৃত্বের মূল স্তম্ভগুলোকে গুপ্তহত্যা মারফত সরিয়ে ফেলা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে একটা সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দিনক্ষণও স্থির হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট পার্টি ও সরকার অত্যন্ত দক্ষতা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করে পঞ্চমবাহিনীর ঘাঁটি ধ্বংস করে দেয়। তাই ১৯৪১ সালে সোভিয়েট যখন আক্রান্ত হয় তখন হিটলার-বাহিনীকে সাহায্য করার মতো বিশ্বাসঘাতক শক্তি সোভিয়েটে পাওয়া যায় নি। এ প্রসঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নে মার্কিন রাষ্ট্রদূত জোসেফ ই ডেভিস-এর সঙ্গে তৎকালীন সোভিয়েট বিদেশ সচিব লিটভিনভের যে কথোপকথন হয় তার অংশবিশেষ উল্লেখ করা যেতে পারে। ডেভিস প্রশ্ন করেন ঃ "দেশের যারা বড় বড় জেনারেল, যারা দেশের বড় বড় মাথা, তাদের যদি এমনভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, তাহলে স্ট্যালিন কাদের ভরসায় জার্মানির দুর্ধর্ষ শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন?

লিটভিনভ ঃ একটা কথা কি জানেন, আপনাদের আর আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণ মানুষের মধ্যে যে কতখানি শক্তি আছে, আপনারা স্বীকার করতে চান না। আমরা সকলেই সেই সাধারণ মানুষের স্তর থেকে উঠে এসেছি। তাই আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তিটা একটু স্বতন্ত্র।

ডেভিস ঃ আপনার কথা স্বীকার করে নিলেও, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমরা যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি এবং হিটলার প্রস্তুত। সে আপনাকে নতুন শক্তি তৈরি করতে সময় দেবে না।

লিটভিনভ ঃ কাজেই কোনও দিক থেকেই আজ আর অপেক্ষা করা যে চলে

না — এটা আপনার কথা থেকেই প্রমাণ হচ্ছে। ধীরে সুস্থে কোন কিছু করবার সময় এটা নয়। এখন আমাদের কথাটা শুনুন। আমার বক্তব্য হল, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স সোভিয়েট রাশিয়ার কাছে যে জিনিস চাইছে, সে জিনিস ষোল আনা এইভাবেই সোভিয়েট রাশিয়া তাদের দিতে পারে। হিটলারের সঙ্গে যে যুদ্ধ বাধবে, সেই যুদ্ধে যদি দেশের ভেতরে এতগুলো শক্তিশালী লোক সোভিয়েটের বিরুদ্ধতা করবার জন্য বেঁচে থাকে তাহলে সোভিয়েট রাশিয়া কখনোই জার্মানিকে হারাতে পারবে না। জার্মানিকে হারানোর জন্যই সোভিয়েট রাশিয়াকে একান্ত নির্মমভাবে তার ভবিষ্যৎ কাঁটাগুলো সরিয়ে ফেলতে হল। এবং অচিরেই দুনিয়া একদিন বুঝতে পারবে, আমরা কী করেছি। ...আমরা হিটলারি নাৎসি বিশ্ব-আধিপত্যের বিরুদ্ধে নিজেদের যেমন সুরক্ষিত করছি, তেমনি তার দ্বারা আমরা সমগ্র বিশ্বের সেবা করে যাচ্ছি।...

১৯৪১ সালে হিটলার-বাহিনীর আক্রমণের সময়ে সোভিয়েট যদি ১৯৩৬-৩৭ সালের অবস্থায় থাকতো তাহলে পৃথিবীর মানচিত্রের চেহারা যে কী হত বলা কঠিন।

সোভিয়েটের উপর জার্মান আক্রমণের প্রথম সপ্তাহ অতিক্রান্ত। ফ্যাসিস্ট সমরবাহিনী সোভিয়েট এলাকায় ধ্বংসোন্মত্ত। ৩০ জুন সোভিয়েট প্রতিরক্ষার সর্বোচ্চ সংস্থা 'স্টেট কমিটি অফ ডিফেন্স' গঠিত হয় ; তার নেতা নির্বাচিত হন স্ট্যালিন।

যুদ্ধের প্রথম দিনগুলিতে কঠোর লড়াই চলে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে। অপরিসীম বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায় সোভিয়েট সীমান্তরক্ষীদের সাব-ইউনিটগুলো। মাটি কামড়ে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালায় তারা। সীমান্ত লড়াইয়ের এমনই একটি স্থান হল ব্রেস্ট দুর্গ। চতুর্দিক থেকে শত্রু-অবরুদ্ধ ব্রেস্ট দুর্গের সেনারা মাসাধিককাল প্রতিরোধ চালিয়ে যায়। মৃত্যুর আগে দুর্গ প্রাকারে তাঁরা লিখে যান "আমরা পাঁচ জন — সেদোভ, গ্রুদোভ, বগোলুব, মিখাইলোভ ও সেলিভানোভ। আমরা লড়াই শুরু করি ২২-৬-৪১ তারিখে ৩টা ১৫ মিনিটের সময়। আমরা মরব, কিন্তু হটব না।" অপর একজন লেখেন — "আমি মরছি, কিন্তু আত্মসমর্পণ করছি না। বিদায় মাতৃভূমি। ২০-৭-৪১।" এমন অসংখ্য বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ঘটতে থাকে সোভিয়েটের মাটিতে।

আক্রমণের এক সপ্তাহ পর ২৯ জুন হিটলারের জেনারেল এফ. গাল্‌ডের তাঁর ডায়েরিতে লেখেন, "রণাঙ্গন থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, রুশরা সর্বত্র শেষ ব্যক্তি পর্যন্ত লড়ছে, কেবল এক-আধ জায়গায় আত্মসমর্পণ করছে" (সামরিক ডায়েরি, খণ্ড ৩, বই - ১, পৃঃ ৩১৭)। ফিল্ড মার্শাল ক্লেইস্টও

পরবর্তীকালে বলেছিলেন, সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী শুরু থেকেই "গঠিত হয়েছিল সেরা যোদ্ধাদের নিয়ে এবং ওরা লড়েছিল অসাধারণ দৃঢ়তা ও বিস্ময়কর স্থৈর্যের সঙ্গে।" (দ্য জার্মান জেনারেলস্ টক — হার্ট, বি লিড্ডেল)।

স্ট্যালিনের ঐতিহাসিক বেতার ভাষণ, সর্বাত্মক প্রতিরোধের ডাক

জার্মান আক্রমণের দ্বাদশ দিনে ১৯৪১-এর ৩ জুলাই বেতার ভাষণে রুশ জনগণের উদ্দেশ্যে উদাত্ত আহ্বান জানালেন স্ট্যালিন। সম্বোধনে তিনি বলেন, "আমার দেশবাসী ভাইবোনেরা, নাগরিক ও কমরেডগণ, আমাদের সেনা ও নৌবাহিনীর যোদ্ধারা, আজ আমি আপনাদের উদ্দেশ্যেই বলছি।" তারপর বলেন, "বিশ্বাসঘাতক হিটলারপন্থী জার্মানি আমাদের পিতৃভূমির উপর গত ২২ জুন যে সামরিক আক্রমণ শুরু করে, তা এখনও চলছে। ... হিটলার বাহিনী লিথুয়ানিয়া দখল করতে সফল হয়েছে, লাতভিয়ার একটা বড় অংশ, পশ্চিম বেলারুশ ও ইউক্রেনের পশ্চিম অংশ দখল করেছে। ফ্যাসিস্ট বিমানবহর আক্রমণের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত করছে। মুর্মানস্ক, ওরশা, মগিলেভ, স্মোলেনস্ক, কিয়েভ, ওডেসা ও সিবাস্তিপোলের ওপর তারা বোমাবর্ষণ করে চলেছে। ... দেশের সামনে আজ গভীর বিপদ।" কিন্তু তাতে আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। স্ট্যালিন বলেন, "কোনও সেনাবাহিনীই অপরাজেয় নয়। অতীতেও ছিল না, এবং আজও নেই। ইউরোপের মাটিতে তারা (হিটলার বাহিনী) কোন দৃঢ় প্রতিরোধের সামনে পড়েনি। একমাত্র আমাদের দেশের মাটিতেই তাদের যথার্থ প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছে এবং লালফৌজের প্রতিরোধের আঘাতে জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর সবচেয়ে সেরা ডিভিশনগুলিকে পরাজয় মানতে হয়েছে। এটাই প্রমাণ করে যে, এই সেনাবাহিনীকেও ধ্বংস করা সম্ভব।" তারপর বলেন, "ট্যাঙ্ক এবং জঙ্গি বিমানে সুসজ্জিত ভয়ঙ্কর শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সৈন্যবাহিনী অমিত শৌর্যের সঙ্গে লড়াই করছে। অসংখ্য প্রতিকূলতার মোকাবিলা করে বহু আত্মদানের মধ্য দিয়ে লালফৌজ ও লাল নৌবাহিনী প্রতি ইঞ্চি সোভিয়েট ভূমির জন্য মরণপণ লড়াই চালাচ্ছে। হাজার হাজার ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধবিমানে সজ্জিত লালফৌজের মূল শক্তি এখন যুদ্ধে নামছে। লালফৌজের সৈনিকরা বীরত্বের অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করছে। শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিরোধ সবদিক থেকে আরও জোরদার হচ্ছে। ... শত্রুর পরাজয় অনিবার্য, জয় আমাদের হবেই।" সেই সঙ্গে রুশ জনগণের উদ্দেশে তিনি নির্দেশ দেন, "কোথাও লালফৌজ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হলে, সেখান থেকে সমস্ত ধরনের যানবাহন

সরিয়ে নিতে হবে, যাতে একটিও রেলইঞ্জিন, একটিও রেলগাড়ি শত্রুর হাতে না পড়ে, এক পাউন্ড শস্য, এক গ্যালন পেট্রলও যেন তারা না পায়।" তিনি বলেন, "যৌথ খামারের চাষীরা অবিলম্বে সমস্ত গবাদি পশু সরিয়ে দিন এবং সমস্ত ফসল ফ্রন্টের পিছনে দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিন। ধাতু, শস্য এবং জ্বালানি তেল সহ সমস্ত সম্পদ যা সরানো যাবে না, তা ধ্বংস করে ফেলতে হবে। এর অন্যথা যেন কোনমতেই না হয়।" নির্দেশ দেন, "শত্রু কবলিত এলাকায় ঘোড়সওয়ার ও পদাতিক গেরিলাবাহিনী অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। শত্রুর উপর আঘাত হানার জন্য, শত্রুকে ভুল পথে চালনা করার জন্য ছোট ছোট গোষ্ঠী তৈরি করতে হবে। সর্বত্র গেরিলা হানাদারি চালিয়ে যেতে হবে। সেতু, রাস্তা, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ লাইন উড়িয়ে দিতে হবে। অরণ্য, গুদাম, যানবাহন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। শত্রুকবলিত এলাকায় এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে শত্রু ও তার সহযোগীরা সেখানে তিষ্ঠতে না পারে। পদে পদে তাদের ঘেরাও করে মেরে শেষ করে দিতে হবে। শত্রুর সমস্ত কার্যক্রম ব্যর্থ করে দিতে হবে। ফ্যাসিস্ট জার্মানির সঙ্গে এই যুদ্ধ একটা সামান্য যুদ্ধ নয়। এটা কেবলমাত্র দুই সেনাবাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ নয়, এ হল জার্মান ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র সোভিয়েট জনগণের যুদ্ধ। ... কমরেডস্, আমাদের শক্তি অপরিমেয়। গর্বোদ্ধত শত্রুপক্ষ বহু মূল্য দিয়ে এ সত্যটা অচিরেই বুঝতে পারবে। আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে লালফৌজের পাশে দাঁড়াতে বহু হাজার শ্রমিক, যৌথ খামারের কৃষক ও বুদ্ধিজীবীরা এগিয়ে আসছেন। সোভিয়েটের আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ মহাশক্তি রূপে জেগে উঠবে।" সর্বশেষে তিনি আহ্বান জানান, "আসুন, ... শত্রুর বিনাশে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করি। এগিয়ে চলুন, জয় আমাদেরই।"

স্ট্যালিনের আহ্বানে সমগ্র জনগণ উদ্দীপ্ত হয়ে যায়

স্ট্যালিনের এই বেতার ভাষণ সর্বস্তরের সোভিয়েট জনগণের মধ্যে গভীর আস্থা ও প্রবল উদ্দীপনার জন্ম দেয়। যোদ্ধারা তো বটেই, অসামরিক জনগণও নিজ নিজ ক্ষেত্রে কার্যত যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। গুপ্ত গেরিলা অভিযানে, কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনে — সর্বত্রই তাদের মধ্যে সঞ্জীবনী মন্ত্রের মত ধ্বনিত হতে থাকে স্ট্যালিনের আহ্বান — "আমার দেশবাসী ভাই-বোনেরা, আমাদের শক্তি অপরিমেয় ... আসুন, ... শত্রুর বিনাশে আমরা সর্বশক্তি নিয়োজিত করি।" ব্রিটিশ লেখক প্যাট স্লোয়ান তাঁর "রাশিয়া রেজিস্টস্" গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লেখেন, "স্ট্যালিনের ৩ জুলাইয়ের আহ্বান উৎপাদনের কাজে অভাবনীয় উদ্দীপনা এনে

দেয়।... সোভিয়েটের কারখানায় কারখানায় স্লোগান ওঠেঃ 'লালফৌজ যেভাবে যুদ্ধ করছে, তেমন জীবনপণ করে কাজ কর। শিল্পের মতো কৃষিতেও দ্রুত উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিপুল যজ্ঞ শুরু হয়।'

প্যাট স্লোয়ান লেখেন, "...কর্মক্ষম সকল পুরুষ মহিলা ও যুবকরা খেতের কাজে যোগ দেয়। যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য যাদের কাজ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে, তাদের অভাব মিটিয়ে দিতে ছাত্ররা ও স্কুলের শিশুরাও স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে খেতের কাজে নেমে যায়। শুধুমাত্র খারকভ শহরের স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই গ্রামে যায় ১২ হাজার স্বেচ্ছাসেবক।

"কিন্তু খাদ্য পরিস্থিতি সংক্রান্ত সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা হচ্ছে, জাতীয় জরুরি অবস্থায় সাড়া দিয়ে যৌথ খামারের চাষীরা বাস্তবে শহরগুলিতে খাদ্য সরবরাহ বাড়িয়ে দেয় এবং কোনও দাম বৃদ্ধি না করেই। এর ফলে, ইতিহাসে এই প্রথম শান্তির সময়ের চেয়ে যুদ্ধের সময়ে, স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে, চাষীরা বেশি খাদ্যের যোগান দেয়। এবং যুদ্ধের সময় মুনাফাবাজদের কার্যকলাপ, যা বাকি বিশ্বে একটা স্বাভাবিক ঘটনা, সোভিয়েট ইউনিয়নে তার অনুপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।"

গ্রামে গ্রামে সোভিয়েট প্রতিরোধ প্রসঙ্গে স্লোয়ান আরও লেখেন, "যৌথ খামারের চাষীরা লুঠেরাদের বিরুদ্ধে পাহারায় অংশ নিচ্ছে। আজকের কোন সোভিয়েট গ্রামে কোন অচেনা ব্যক্তি প্রবেশ করে নিজের পরিচয়ের প্রমাণপত্র দেখাতে না পারলে বিপদে পড়ে যাচ্ছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে একটি গ্রামের পাশের জমিতে হঠাৎ একটি নাৎসি বিমান বাধ্য হয়ে নেমে পড়ে। তিনজন আরোহী নামতেই দেখে, কৃষক রমণীরা বিমানকে ঘিরে ফেলেছে, হাতে তাদের কাঁটাওয়ালা লাঠি, বঁটি, হাতুড়ি ও আঁকশি। জার্মানরা কোন বাধা দিতে পারেনি, ঘেরাও হয়ে যায়। এক সামরিক অফিসার কুর্নেট বলেন — "আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে, আমরা জার্মান অফিসাররা কৃষক মহিলাদের হাতে বন্দি হয়েছি! আমি অনেক যুদ্ধ করেছি, কিন্তু কখনো অতি-সাধারণ লোকদের দ্বারা এমন প্রতিরোধের সামনে পড়িনি।" এরপর স্লোয়ানের মন্তব্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লেখেন, "জাতীয় প্রতিরক্ষার লড়াইতে সোভিয়েটের সমগ্র জনগণ যেভাবে ঝাঁপ দিয়েছে তাতে পরিষ্কার যে, সোভিয়েট জনগণের মধ্যে একটা একতা, ঐক্যের একটা শক্ত বাঁধুনি অবশ্যম্ভাবীরূপে কাজ করছে। কীভাবে এটা সম্ভব ? এর রহস্য কোথায় ? এই রহস্যের পিছনে সরল সত্যটি হচ্ছে — সোভিয়েটের জনগণ জানে যে, যাবতীয় কৃষি খেতখামার, জমি, কলকারখানা — সবকিছুর মালিক তারাই।... সোভিয়েট শ্রমিকরা জানে, উৎপাদনে তারা যে বাড়তি শ্রম দিচ্ছে তা থেকে কেউ মুনাফা

করবে না, তা থেকে কেউ বিলাস-ব্যসনে দিনযাপন করবে না। একজন রুশ রেলশ্রমিক বা উক্রেনীয় খনিশ্রমিক যুদ্ধকালীন যে অতিরিক্ত শ্রম দান করছে, তা থেকে কোন অর্থশালী গোষ্ঠী অধিক লভ্যাংশের দাবি করবে না। তার ফলে তারা যখন তাদের সবচেয়ে বেশি শ্রম দান করছে তখন তাদের এই অনুভূতি হচ্ছে না যে, তাদের কাজ 'করানো' হচ্ছে এবং তার দ্বারা কারও কোন মুনাফা অর্জিত হবে। ... মুনাফাবাজরা নিশ্চিহ্ন — প্রায় পুরো নিশ্চিহ্ন।..."

স্লোয়ান আরও বলেন, "একটা বাড়িতে যদি আগুন লাগে, তবে শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে সারা পরিবার আগুন নেভাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যার যা সামর্থ্য তাই দিয়ে সে কিছু করবার চেষ্টা করে। ঠিক একই জিনিস ঘটেছে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নে। সোভিয়েট তাদের পরিবার ; স্ট্যালিন তাঁর ভাষণের সম্বোধনে যখন 'দেশবাসী ভাইবোনেরা' বলে আহ্বান জানান, তখন সেটা শুধু কথার কথা ছিল না, সম্বোধনের ঐ শব্দগুলো একটা তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ বহন করছিল। ... সমগ্র সোভিয়েট জনগণ যুদ্ধে যে ঝাঁপ দিল — এখানেই রয়েছে তার রহস্য।"

লালফৌজ ও সোভিয়েট জনগণ জয়ের লক্ষ্যে প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তোলে। বিশ্বের মানুষ সেই প্রতিরোধের সংবাদে বিস্ময়ে ও আনন্দে আপ্লুত হয়ে যায়। হিটলারের নাৎসি বাহিনীর কাছেও এই প্রতিরোধ ছিল অপ্রত্যাশিত। ফ্যাসিস্ট সমরনায়কদের সমস্ত পরিকল্পনা ও হিসেবনিকেশ মুহুর্মুহু গুলিয়ে যেতে থাকে, তাদের আবার নতুন প্ল্যান সাজাতে হয়, আবার সেটাও ভণ্ডুল হয়ে যায়। এমনই চলতে থাকে।

নাৎসি পত্রিকা ফ্র্যাঙ্কফুর্ট জেইটুং-এর সামরিক সংবাদদাতা স্বীকার করতে বাধ্য হন, "জার্মান জনগণকে বুঝতে হবে যে, রুশ যুদ্ধ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা জটিল এবং সেটা এইজন্য নয় যে অনেক দূর থেকে গিয়ে জার্মান বাহিনীকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে ; আসল কারণ — বেলজিয়ান, ফরাসি ও যুগোশ্লাভ বাহিনীর তুলনায় লালফৌজের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন।" তারা আরও লেখে, "সোভিয়েট ফৌজ আত্মসমর্পণ করতে বা পিছু হটতে চাইছে না। শত্রুবাহিনীর নৈতিক বিপর্যয় — যা পশ্চিমাঞ্চলে জয়লাভের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল — সেটা কিন্তু পূর্বাঞ্চলে ঘটছে না" (১০ জুলাই ১৯৪১ ডেইলি টেলিগ্রাফ-এ উদ্ধৃত)। ডেইলি টেলিগ্রাফ (১ আগস্ট ১৯৪১) লিখছে, "সোভিয়েট ফৌজ প্রুশিয়ানদের পিষে ফেলছে। নাৎসিদের থেকে তাদের নৈতিকতার ভিত্তি অনেক উন্নত ; কারণ তারা লড়াই করছে নিজের দেশ রক্ষা করতে, আর হিটলারের বাহিনী এসেছে এক স্বৈরাচারীর বিশ্বসাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন রূপায়িত করতে।"

সোভিয়েট প্রতিরোধে বিশ্বের সমর বিশেষজ্ঞরাও বিস্মিত

সোভিয়েটের বারংবার মৈত্রী-চুক্তির আবেদনে যে ব্রিটেন বছরের পর বছর সাড়া দেয়নি, যুদ্ধের চতুর্থ সপ্তাহে সোভিয়েট-প্রতিরোধের চেহারা দেখে সেই ব্রিটেন তখন সোভিয়েটের সংগে মৈত্রীচুক্তিতে স্বাক্ষর করে।

আনা লুই স্ট্রং 'স্ট্যালিন যুগ' গ্রন্থে লেখেন, "ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনের উপর তাঁর ১৯৫৬ সালের আক্রমণে বলেছেন যে, জার্মানদের অতর্কিত আক্রমণ স্ট্যালিনকে বিমূঢ় করেছিল, প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সমরায়োজন তাঁর ছিল না। ... কিন্তু দুনিয়ার সামরিক বিশেষজ্ঞরা এই মত পোষণ করেননি। তাঁরা বরং সোভিয়েটের প্রতিরোধ-সংগ্রাম ও তার সমরসজ্জা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। ১৯৪১-এর ২৯ জুলাই নিউইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় জর্জ ফিল্ডিং এলিয়ট লেখেন, 'জার্মানদের এই প্রথম এমন একটা বাহিনীর সম্মুখীন হতে হয়েছে যা ১৯১৮ সালের যুদ্ধের জন্য শিক্ষিত হয়নি, শিক্ষিত হয়েছে ১৯৪১-এর যুদ্ধের জন্য।' ১১ আগস্ট ম্যাক্স ওয়ার্নার 'নিউ রিপাবলিক' পত্রে লেখেন, 'এ বাহিনী হচ্ছে গঠনে আধুনিক, রণকৌশলে দক্ষ, রণনীতিতে বাস্তবপন্থী'। লড়াই কিছুকাল চলার পর সামরিক পর্যবেক্ষকরা ঘোষণা করেন, হিটলার যে যুদ্ধ-কৌশলের উপর নির্ভর করতেন, রুশরা সেই 'ঝটিকা আক্রমণে'র সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। জার্মানদের কৌশল ছিল, ট্যাঙ্ক আর বিমানের প্রচণ্ড আঘাতে শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া, পিছু পিছু রণাঙ্গনের অসামরিক 'নরম' পশ্চাদ্‌ভাগে সাঁজোয়া সৈন্যদের অর্ধবৃত্তাকারে ছড়িয়ে দেওয়া, যাতে রণাঙ্গনস্থিত শত্রুপক্ষ পশ্চাদভূমি থেকে কোনরকম সাহায্য না পায়। জার্মানরা যে দেশেই এ কায়দা অবলম্বন করেছিল, সে দেশই তারা অতি দ্রুত জিতে নিয়েছিল। আনা লুই স্ট্রং লিখছেন, "বার্লিনে থাকতে একজন মার্কিন সংবাদদাতা আমাকে বলেছিলেন, 'রক্তমাংসের মানুষ এ আক্রমণ সহ্য করতে পারে না।' রুশরা জার্মানদের এ কৌশল ব্যর্থ করে দিচ্ছে দু'টি উপায়ে এবং দু'টি ক্ষেত্রেই সৈন্যদের দৃঢ় মনোবলের দরকার। জার্মান ট্যাঙ্কগুলো ব্যূহ ভেদ করা মাত্র রুশরা আবার তাদের ব্যূহ এমনভাবে ঠিক করে নিচ্ছে যার ফলে জার্মান ট্যাঙ্কচালকদের থেকে তাদের সাহায্যকারী পদাতিকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এর ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা ঘটে তার মধ্যে জার্মান ও রুশ — দু'পক্ষই সব দিকে লড়তে থাকে। রুশরা স্থানীয় লোকেদের সাহায্যের উপর নির্ভর করতে পারে। জার্মানরা রাশিয়ায় কোন 'নরম বেসামরিক পশ্চাদভাগ' পায়নি। তারা পাচ্ছে যৌথ-খামারের সেই চাষীদের, যারা গেরিলা-সৈন্যদলে সংঘবদ্ধ হয়ে লালফৌজের সংগে সুশৃঙ্খল সহযোগিতা করে যেত। ... হিটলারকে এই প্রথম একটা সমগ্র

জাতির সংগে লড়াই করতে হচ্ছে। ... সোভিয়েটের রণধ্বনি ঃ 'যেখানে কামান গর্জাচ্ছে সেখানেই শুধু আমাদের রণাঙ্গন নয় ; আমাদের রণাঙ্গন হচ্ছে প্রত্যেকটি কারখানায়, প্রত্যেকটি খামারে।"

সমগ্র সোভিয়েট জনগণ যুদ্ধপ্রস্তুতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল

যুদ্ধের ৬ সপ্তাহ পর দেখা গেল, জার্মানির তড়িৎগতি বিজয়-অভিযানের পরিকল্পনা মুখ থুবড়ে পড়েছে। হিটলারের লক্ষ্য ছিল, বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ চালিয়ে দ্রুত সোভিয়েটকে দখল করা। বাস্তবে, সাময়িকভাবে সামরিক অগ্রগতিও তারা অর্জন করে। সোভিয়েটের বিশাল অঞ্চল অধিকারও করে। কিন্তু সেজন্য বহু মূল্য তাদের দিতে হয়েছে। তাদের পরিকল্পনা ছিল কিয়েভ ও স্মোলন্স্ক এক সপ্তাহের মধ্যে দখল করা ; সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। তাদের পরিকল্পনা ছিল এক মাসের মধ্যে মস্কো ও লেনিনগ্রাদের পতন ঘটানো ; সেই পরিকল্পনাও তারা কার্যকরী করতে পারে নি। তারা তখন আটকে আছে স্মোলেন্স্ক-এরও আগে, অর্থাৎ লেনিনগ্রাদ থেকে ১০০ মাইল দূরে এবং কিয়েভ থেকে ৮০ মাইল দূরে। পোল্যান্ড, ফ্রান্স, গ্রীস, যুগোশ্লাভিয়া এবং ক্রীট দখলে তারা যত দ্রুত সাফল্য পেয়েছিল সোভিয়েটে কিন্তু তাদের সেই সাফল্য এল না। হিটলারকে বাধ্য হয়ে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ চালাতে হয়। জার্মান অর্থনীতির পক্ষে তার ভার সহ্য করা সহজ হয়নি। নাৎসি বাহিনীর 'অপরাজেয়তা'র তত্ত্ব একটা বিরাট ধাক্কা খেল। অগ্রাভিযানের এই ব্যর্থতা ঢাকতে নাৎসি রেডিও-কে বলতে হয়, জার্মানবাহিনীকে লড়তে হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্রে শ্রেষ্ঠ এক শত্রুর বিরুদ্ধে। সোভিয়েট প্রতিরক্ষাবিভাগ অনুসৃত অদ্ভুত কৌশলের ফলে জার্মান হাইকমান্ডকেও তাদের রণকৌশল বদলাতে হচ্ছে।

আনা লুই স্ট্রং লেখেন, "আনে উ'হেয়ার ম্যাক্করমিক 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্'-এ লিখলেন, 'রাশিয়ার ছ'সপ্তাহের প্রতিরোধ দেখে লন্ডন, ওয়াশিংটন এবং পরদেশে আশ্রয়প্রাপ্ত ইউরোপীয় সরকারদের মত বদলে গেছে।' তা দেখে 'কারারুদ্ধ ইউরোপে'রও মত বদলে যায়। ইউরোপে গুপ্ত প্রতিরোধের আন্দোলন দ্রুত সক্রিয় হয়ে ওঠে।"

পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সাধারণত সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠতা চায় না। বরং তারা চায় — সামরিক বাহিনী সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভীতি ও দূরত্ব বিরাজ করুক, যাতে জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করতে অসুবিধা না হয়। যুদ্ধের সময় পুঁজিবাদী শাসকরা সাধারণত দেশরক্ষায় জনগণকে সামিল করে না, করতে চায়ও না। জনগণকে কেবল ত্যাগ

স্বীকার করতে বলে। জনগণ কেবল যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করে, মরে, সর্বস্ব হারায়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঠিক এর বিপরীত চিত্র। সামরিক বাহিনীও জনগণের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়, তাদের পারস্পরিক গভীরতর সম্পর্ক গঠনে উৎসাহিত করা হয়। তাই জার্মানির ফ্যাসিস্ট বাহিনী যখন বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশকে আক্রমণ করেছে, তখন কেবল সেই দেশের মিলিটারির সঙ্গেই প্রধানত তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে, অসংগঠিত জনগণ সেখানে ভীত, ত্রস্ত, বিশৃঙ্খল, পলায়মান। কোন কোন দেশে যে ফ্যাসিবিরোধী পার্টিজান লড়াই ও গণপ্রতিরোধ হয়েছে, তা সংগঠিত করেছে সেদেশের কমিউনিস্টরা, তারা সোভিয়েটের প্রেরণায় লড়েছে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্ষেত্রে জার্মানিকে লড়তে হয়েছে সমগ্র সোভিয়েট জনগণের বিরুদ্ধে। রণাঙ্গনে নিয়মিত সেনার পরিপূরক হয়ে লড়াই করেছে সোভিয়েট জনগণ।

এ প্রসঙ্গে মার্কিন সাংবাদিক আনা লুই স্ট্রং লেখেন ঃ "সোভিয়েটের প্রচণ্ড জনবলের কথা সকলেই স্বীকার করত। কিন্তু খুব অল্প লোকেই জানত, জনগণের এই বল বা শক্তি ইতিমধ্যে কতগুণ উন্নত হয়ে গিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সমাজে চিকিৎসার ব্যবস্থা, জন্মসময়ে শিশু ও মায়ের যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকার ফলে জাতীয় স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। সেনাদপ্তরের তথ্যে দেখা গিয়েছিল, সৈন্যদের দেহের উচ্চতা ও ওজন, তাদের বুকের বহর ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছিল। রংরুটদের অর্থাৎ শিক্ষার্থী সেনাদের শিক্ষা ও সামরিক জ্ঞান প্রতি বছর বাড়ছিল। লক্ষ লক্ষ কাজ জানা মেয়ে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়েছিল; সৈন্যবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগে তো মেয়েদেরই প্রাধান্য ছিল। যানবাহন, সরবরাহ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও মেয়েরাই কাজ করত। অসামরিক লোকেরা সৈন্যদের সহযোগিতা করার জন্য শরীরের দিক থেকেও তৈরি হয়ে উঠেছিল। ষাট লক্ষ লোক 'প্রতিরক্ষা ও শ্রমের জন্য প্রস্তুত' বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এ পরীক্ষার জন্য হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতরানো, লাফানো, নৌকা চালানো, বরফের উপর দিয়ে বরফ জুতো পায়ে হড়কে চলা ইত্যাদিতে পাকা হতে হত। অনেকেই প্যারাসুটের সাহায্যে বিমান থেকে লাফিয়ে পড়া ও গ্লাইডার চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। বিনাবেতনে এ পাঠ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ছোট ছেলেমেয়েরাও তাদের 'কৃষ্টি ও বিশ্রাম' বাগিচায় গিয়ে প্যারাসুট-গম্বুজ থেকে লাফাতে ভালবাসত।

"দেশরক্ষার জন্য যেমনটি প্রয়োজন যৌথ খামারগুলোর গড়নটিও ছিল তেমনি। প্রত্যেক খামারে কয়েকটি গ্রুপে কর্মীদল থাকত, প্রত্যেক দলের একজন

করে নেতা ছিল। এরা সৈন্যবাহিনীর অঙ্গীভূত শ্রমিক দল হিসেবে কাজ করতে পারত, ...প্রত্যেক খামারের একটা করে নিজস্ব বেসরকারি প্রতিরক্ষা দলও ছিল। তারা ভালভাবেই গুলি চালাতে শিখত। তাদের নিজেদের অস্ত্রও ছিল। চোরাগোপ্তা লড়াইয়ের জন্য গেরিলাযোদ্ধাদের দল এইভাবে আগে থেকে গঠিত হয়েই ছিল।"

আনা লুই স্ট্রং আরও লিখেছেন ঃ "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে জার্মানদের ট্যাঙ্ক আটকা পড়লে বা জার্মান বিমান নামতে বাধ্য হলে, স্থানীয় চাষী 'গেরিলারা' সেই ট্যাঙ্ক বা সেই বিমান চালিয়ে রণাঙ্গণের পিছনে পৌঁছে দিত। ১৯৪৩-এর মার্চ মাসে আমেরিকার লাইফ পত্রিকার যে বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল, তাতে লেখা ছিল, 'খামার যৌথকরণের জন্য যে মূল্যই দেওয়া হয়ে থাক না কেন, এই বৃহৎ খামারগুলো যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্ভব করেছিল। তার ফলে উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়ে যায়, যন্ত্রশিল্পের জন্য চাষীদের মধ্যে থেকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। তাদের না পেলে রাশিয়া তার যন্ত্রশিল্প গড়ে তুলতে পারত না, গোলাগুলি তৈরি করে জার্মানবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে পারত না।' ...নিউ ইয়র্কের এক সংবাদপত্রের সম্পাদক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'যে রুশ চাষীদের ট্রাক্টর দিলে চালাতে পারত না, মাঠে ফেলে মরচে ধরিয়ে দিত, তারাই দেখা যাচ্ছে, এখন হাজার হাজার ট্যাঙ্ক খুব নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করছে। এটা কী করে সম্ভব হল!' আমি বললাম, 'এ হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল।' কিন্তু ৯ সপ্তাহ যুদ্ধের পর (আগস্টের শেষে) মস্কো যখন তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রকাশ করে জানাল, যে তাদের ৭৫০০ কামান, ৪৫০০ বিমান এবং ৫০০০ ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে, তখন পৃথিবীর লোক চমকে উঠল। এত ক্ষতির পরও যে বাহিনী লড়ে যেতে পারে, তার নিশ্চয়ই পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বা দ্বিতীয় বৃহত্তম সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।"

এদিকে জার্মানরা উক্রাইনে প্রবেশ করার পর, শস্য কেটে নেওয়ার তাড়া পড়ে। চাষীদের প্রথম কাজ হল শস্য বাঁচানো। শিক্ষক, ছাত্র, অফিসের কেরানি — সকলেই দৌড়ালো চাষীদের সাহায্য করতে; এমনকী যেই ফ্রন্টে লড়াইয়ের গতি একটু কমে এলো, সৈন্যরা পর্যন্ত ফসল কাটতে লাগল। ১০ সেপ্টেম্বর নাগাদ জার্মানরা যখন উক্রাইনের মাঝখানে এসে পড়ল, ফসলের শতকরা ৬০ ভাগ তখন পূর্বদিকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ঐ সময় লক্ষ লক্ষ চাষীও নিজেদের খামারের মোটর, ট্রাক ও ট্রাক্টরগুলো চালিয়ে নিয়ে পূর্বদিকে সরে যায়; সৈন্যবাহী ফিরতি গাড়িতে করেও অনেকে চলে যায়। ইউরোপের বাস্তুচ্যুতদের মতো তাদের বেকার থাকতে হয়নি, নিজেদের হাতিয়ার সঙ্গে করে আর কোথাও গিয়ে

খাদ্য উৎপাদনের কাজে তারা লেগে যায়। এরা যৌথ খামারের সদস্য, সবকিছু করেছেও যৌথভাবেই। আবার যুদ্ধের সমাপ্তির পরে, অন্য দেশগুলিতে যখন দেখা গেছে স্বামী-সন্তানহারা বিধবা ও বাবা-মা হারা অনাথ শিশুতে ছয়লাপ, ভিখারির মত তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, অনাহারে মরছে — সোভিয়েটে সেই দৃশ্য দেখা যায়নি। কারণ, বিধবা, শিশু সহ সবাইকে বুকে টেনে নিয়েছে যৌথ খামার; সেখানে যেমন তাদের কাজের ব্যবস্থা হয়েছে, তেমনি সেখানেই তারা পেয়েছে পারিবারিক স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন, খাওয়া-পরা-শিক্ষা-চিকিৎসা। এমনকী অভাব অনটনও তারা সমভাবে ভাগ করে নিয়েছে। এই হল সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

বহু চাষী জার্মান অধিকৃত এলাকায় থেকে যায়; গেরিলা দলের যোদ্ধা হয়ে পিছন থেকে তারা জার্মানদের উপর আঘাত হানতে থাকে। তারা চাইছে, সবকিছু নিজেদের জন্য বাঁচাতে, শত্রুর নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে। শত্রুরা এসে পড়েছে বুঝলে প্রত্যেকটি শিল্প-কারখানার শ্রমিকরা যন্ত্রপাতি খুলে ফেলছে, তারপর যন্ত্রাংশগুলোকে গ্রীজ মাখিয়ে, প্যাক করে পূর্বদিকে চালান দিচ্ছে; নিজেরা পূর্বমুখী হচ্ছে। শ্রমিকরা নিজেদের যন্ত্রপাতি সঙ্গে করে পূর্বদিকে, সাইবেরিয়া বা উরাল অঞ্চলে তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আবার কারখানা খাড়া করছে।

জার্মানরা যখন খারকভ শহর অধিকার করে ফেলেছে, 'খারকভ ট্রাক্টর কারখানা' তখনও একদিনের জন্যও কাজ বন্ধ না রেখে হিটলারের বিরুদ্ধে ট্যাঙ্ক তৈরি করে গিয়েছে। কারখানার অধিকাংশ শ্রমিকই যন্ত্রপাতি খুলে নিয়ে পূর্বদিকে চলে যায়। কিন্তু পর্যাপ্ত শ্রমিক থেকে যায় আগেকার তৈরি যন্ত্রাংশগুলো জুড়ে শেষ ট্যাঙ্কগুলো তৈরি করে সেগুলো যুদ্ধরত লালফৌজের হাতে তুলে দেবার জন্য। খারকভে তাদের উৎপাদন বন্ধ হবার আগেই পূর্বদিকে তাদের নতুন তৈরি প্রধান কারখানার উৎপাদন শুরু হয়ে যায়।

সোভিয়েটের এই রণকৌশলের ফলে জার্মানরা কীরকম রিক্ত হয়ে পড়ে, সেকথা হাওয়ার্ড কে স্মিথের 'বার্লিন থেকে শেষ ট্রেন' গ্রন্থে বলা হয়েছে। জার্মানির সমরযন্ত্র ইউরোপের লুঠ করা সম্পদে ফেঁপে উঠেছিল; কিন্তু হিটলারবাহিনী রাশিয়ায় প্রবেশ করলে তাদের অনাহার শুরু হয়, রাশিয়ার খাদ্য-পানীয় তারা দখল করতে পারেনি। তাদের সৈন্যরা নীপার নদীর তীরে এসে, বিধ্বস্ত বাঁধের ওপারে বৃহৎ নীপার শিল্প কারখানাগুলোর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি দেখে আনন্দে নেচে ওঠে। স্মিথ বলেছেন, সোভিয়েট ইউনিয়নে পা দেওয়ার পর থেকে তারা আর কোন কারখানা বাড়িকে গোটা অবস্থায় পায়নি। কিন্তু

বাড়িগুলোয় ঢোকার পর তারা আবিষ্কার করল, মায় নাট-বল্টু পর্যন্ত সমস্ত যন্ত্রপাতি পূর্বদিকে চলে গিয়েছে। স্মিথ মন্তব্য করেছেন, 'এই হল সত্যিকারের প্রতিরক্ষা।' ৩ জুলাই বেতারভাষণে স্ট্যালিনের আহ্বানকে অক্ষরে অক্ষরে রূপ দিয়েছিল সোভিয়েট জনগণ। তীব্র ভয়ঙ্কর আক্রমণের মোকাবিলা করতে করতে সোভিয়েট বারবার আবেদন জানালো — ব্রিটেন ও আমেরিকা যেন পশ্চিম রণাঙ্গনে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলে লড়াই শুরু করে দেয়। তাহলে জার্মান বাহিনীর পুরো চাপ সোভিয়েটের উপর পড়বে না, বাহিনীর একটা অংশকে তখন হিটলার পূর্বের সোভিয়েট রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে পশ্চিম রণাঙ্গনে পাঠাতে বাধ্য হবে, তাহলে লড়াইটা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। ব্রিটেন বলল — এখনও দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলে লড়বার সময় হয়নি। সোভিয়েট বলল — তাহলে একটা কাজ অন্তত কর; রোমানিয়ার যে পোলেইস্তি তৈলক্ষেত্র থেকে জার্মানবাহিনীর বিমান ট্যাঙ্ক ও মোটর যানের সমস্ত তেল সরবরাহ হচ্ছে, বিমান থেকে বোমা মেরে সেই তৈলক্ষেত্রটা অন্তত ধ্বংস করে দাও। ব্রিটেন ও আমেরিকা তাতে গুরুত্বই দেয়নি। অথচ সেই তৈলক্ষেত্রটিকে তারা বোমা দিয়ে ধ্বংস করে দিল ১৯৪৪ সালে, যখন সোভিয়েট ফৌজ নাৎসিবাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে ঐ তৈলক্ষেত্রটির দখল নিতে যাচ্ছিল।

মস্কো ও লেনিনগ্রাদ রক্ষার লড়াই

১৯৪১-এর নভেম্বর নাগাদ, জার্মানরা উর্বর উক্রাইন প্রদেশ দখল করে নেয়, কিয়েভ লুঠ করে। উত্তরের দুর্গ লেনিনগ্রাদ শহর অবরোধ করে। তিনদিক থেকে মস্কো শহর ঘিরে ফেলে। মস্কোর সুউচ্চ গম্বুজগুলো তখন জার্মানরা দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু স্ট্যালিন মস্কোকে পৃথিবীর মধ্যে সুদৃঢ়তম দুর্গনগরী হিসেবে বহু আগেই গড়ে তুলেছিলেন নিঃশব্দে। আধুনিক দুর্গে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় একটা বৃহৎ সৈন্যদলের স্বচ্ছন্দ গতিবিধির ব্যবস্থা থাকা জরুরি। মস্কোতে তা ছিল। লড়াইয়ের সমস্ত উপকরণ শহরের মধ্যেই তৈরি হত। বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা চলত শহরের পিছনের কয়লাখনির দ্বারা। শহর রক্ষার বিমানগুলোর জায়গা ছিল শহরের ভিতরেই। সোভিয়েট সরকার বৈদেশিক দূতাবাসগুলোকে নিয়ে রণাঙ্গন থেকে অনেক দূরে ভোলগা নদীর তীরবর্তী কুইবিশেভ শহরে সরে যায়; ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে উরাল অঞ্চলের মত দূর জায়গায় চলে যায়, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য মস্কো ছেড়ে কুইবিশেভে চলে যাওয়ার জন্য সেনাপতিদের হাজার অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়ে স্ট্যালিন মস্কোতেই থেকে যান। মস্কোতে তাঁর উপস্থিতি জনগণের

মধ্যে গভীর আস্থার সঞ্চার করে। ১৯৪১-এর ৭ নভেম্বর জার্মানদের কামানগুলো যখন মস্কোর উপকণ্ঠে বজ্রনাদ করছে, হিটলার যখন মস্কো অধিকৃত হয়েছে বলে বড়াই করছেন, স্ট্যালিন তখন রেড স্কোয়ারে নভেম্বর বিপ্লব দিবস উপলক্ষে সৈন্য পরিদর্শন করছেন। সেদিন মস্কোর লোকের আত্মবিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়; তাদের প্রধান সেনাপতি সহ তারাই সমস্ত জাতির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে। ১৯৪১-এর ৩০ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া মস্কোর উপকণ্ঠের লড়াই চলে প্রায় ৭ মাস। ১৯৪২-এর ২০ এপ্রিল লালফৌজ শেষ পর্যন্ত জার্মানদের মস্কো থেকে ৬০ মাইল দূরে হটিয়ে দেয়, আর তাদের ফিরে আসতে দেয়নি।

এই যুদ্ধে লেনিনগ্রাদকে আরও অনেক বেশি কষ্ট পেতে হয়েছিল, আড়াই বছর ধরে তাকে অবরুদ্ধ অবস্থায় কামানের জ্বলন্ত গোলার মুখে থাকতে হয়েছিল। তার মধ্যে কিছুদিন সেখানকার লোক দৈনিক পাঁচ স্লাইস রুটি আর দু-গ্লাস জল খেয়ে কাটিয়েছে। তাই খেয়েই তারা যুদ্ধোপকরণ তৈরি করেছে, জার্মানদের সঙ্গে লড়াইও করেছে। জার্মানদের কামানের গোলায় যতজন মারা গেছে, তার চেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে খাদ্যাভাবে। সোভিয়েট কৃষি বিজ্ঞানীরাও লেনিনগ্রাদে অবরুদ্ধ হয়ে না খেতে পেয়ে অনাহারে প্রাণ দিয়েছেন। সোভিয়েট জনগণের জন্য সংরক্ষিত বীজভাণ্ডার থেকে বীজ খেয়ে কিছুদিন তাঁরা বাঁচতে পারতেন, কিন্তু সে চেষ্টাও তাঁরা করেননি। তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন, তবু জনগণের ভবিষ্যতের জন্য রক্ষিত শস্য তাঁরা স্পর্শ করেননি।

যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে জার্মানরা সবচেয়ে বেশিদূর এগিয়েছিল। কিন্তু তাদের গতিরুদ্ধ হয় ঃ উত্তরে — লেনিনগ্রাদে, মধ্যে — মস্কোতে, দক্ষিণে — স্ট্যালিনগ্রাদে। স্ট্যালিনগ্রাদে হয় ওঠে সোভিয়েট প্রতিরক্ষার দক্ষিণের নোঙ্গর, লেনিনগ্রাদ যেমন উত্তরের।

স্ট্যালিনগ্রাদ ফ্যাসিস্ট বাহিনীর কবর রচনা করে

১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে হিটলার হুকুম পাঠান, যত ক্ষয়ক্ষতি হোক স্ট্যালিনগ্রাদ দখল কর। স্ট্যালিনগ্রাদের পতন হলে দক্ষিণ দিক থেকে মস্কোকে ঘিরে ফেলার রাস্তা পাওয়া যাবে, বাকুর তৈলখনিতে যাওয়ার রাস্তা পাওয়া যাবে, ইরান ও ভারতে পৌঁছানোর রাস্তা খুলে যাবে, চীনা-তুর্কিস্তানে জাপানিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পথ খুলে যাবে। হিটলার ঘোষণা করে দেন, প্রত্যেক অফিসার, প্রত্যেক সৈন্য, প্রত্যেকটি রেজিমেন্ট — যারা লড়াই করে স্ট্যালিনগ্রাদে প্রবেশ করবে, তাদের জন্য পুরো ৬০ দিনের ছুটি মঞ্জুর করা হবে। বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধে নিযুক্ত নাৎসি সেনাদের কাছে এই প্রস্তাব কম

লোভনীয় ছিল না। কিন্তু এমন প্রস্তাব সামনে থাকা সত্ত্বেও তারা সফল হতে পারেনি। জার্মান বাহিনীর সর্বাত্মক নৃশংস আক্রমণ এবং তার মোকাবিলায় দুর্জয় সোভিয়েট প্রতিরোধের 'মরণে মরণে আলিঙ্গনের' যে ভয়ঙ্কর ঘটনাবলী তদানীন্তনকালে প্রকাশিত হয়েছে — তা বিশ্বের আর কোন যুদ্ধে কখনো এত বিপুল সংখ্যায় ঘটেনি। সেসবের বিস্তৃত বিবরণ পড়লে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়, বিস্মিত প্রশ্ন জাগে — এমন লড়াই কি সম্ভব! সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল সোভিয়েট জনগণ, স্ট্যালিনগ্রাদের যুদ্ধে।

এই একটা শহরের উপর দিনের পর দিন জার্মানদের হাজারটা বিমান এবং হাজারটা ট্যাঙ্ক আঘাত হেনেছে, সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি দু'হাজার ট্যাঙ্ক ও দু'হাজার বিমান। ফ্যাসিস্টরা স্ট্যালিনগ্রাদকে দু'ভাগে ভাগ করেছে, খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছে। একাধিকবার হিটলার ঘোষণা করেন যে, স্ট্যালিনগ্রাদ তিনি দখল করে ফেলেছেন। সত্যিই, তাঁর ফ্যাসিস্টবাহিনী স্ট্যালিনগ্রাদের প্রায় সবটাই দখল করে নিয়েছিল — শুধু সেখানকার ইস্পাত কঠিন মানুষদের জয় করতে পারেনি।

এ প্রসঙ্গে আনা লুই স্ট্রং লিখছেন, "ভোলগার ওপারে মাটি নেই — স্ট্যালিনগ্রাদে তখন এই কথাটি চালু হয়ে গেছে। স্ট্যালিনগ্রাদের লোকে রাস্তার পর রাস্তায়, বাড়ির পর বাড়িতে, ঘরের পরে ঘরে লড়াই করে চলল। রাইফেল ও হাতবোমা থেকে ছুরি, রান্নাঘরের চেয়ার বা গরম জলটা পর্যন্ত তাদের অস্ত্র। ট্যাঙ্ক কারখানায় ট্যাঙ্ক তৈরি করে কারখানা প্রাঙ্গণ থেকে সোজা জার্মানবাহিনীর ঘাড়ে গিয়ে পড়ছে। জার্মানদের সংবাদে দেখা গেল, 'একটা বাড়িও গোটা নেই।' তারপরেও স্ট্যালিনগ্রাদবাসী মাটির নীচের কুঠুরি থেকে, গুহা থেকে লড়ে চলল। লোকে বলতে লাগল, 'সাহস থাকলে যে কোন ইঁটের ঢিবিকে দুর্গ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।' স্ট্যালিন মস্কো থেকে তার বার্তায় তাঁদের জানালেন, 'একটা ছোট পাহাড় পুনর্দখল করতে পারলেও কিছুটা সময় পাওয়া যায়।' তারপর সাইবেরিয়ার সুদূরপ্রান্তে সুসংগঠিত ও সুশিক্ষিত নতুন 'মজুত' সৈন্যদল সমতলভূমির উপর দিয়ে এসে স্ট্যালিনগ্রাদকে সাঁড়াশির মতো আঁকড়ে ধরল। ৩ লক্ষের উপর জার্মান এই ফাঁদে ধরা পড়ল।" ঘেরাওবন্দী বিশ্বখ্যাত জার্মান সেনাপতি ফন পৌলুস ১৯৪৩-এর ২ ফেব্রুয়ারি আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। এই ফন পৌলুসের মুক্তির বিনিময়ে জার্মানদের হাতে বন্দী স্ট্যালিনের পুত্র ইয়াকভকে মুক্তি দেওয়ার গোপন প্রস্তাব হিটলার দিয়েছিলেন। স্ট্যালিন তা প্রত্যাখ্যান করেন।

জার্মানির হাতে বন্দী স্ট্যালিনপুত্র ইয়াকভ

এ প্রসঙ্গে মার্শাল ঝুকভের লেখা একটি ঘটনা উল্লেখ করতে হয়। স্ট্যালিনের একমাত্র পুত্র ইয়াকভ ছিলেন জার্মান নাৎসি আক্রমণের বিরুদ্ধে একজন সাধারণ দেশপ্রেমিক সৈনিক। যুদ্ধের শেষদিকে, বিজয় যখন সুনিশ্চিত — মার্শাল ঝুকভ লিখছেন — "বিমানবন্দর থেকে সরাসরি স্ট্যালিনের গ্রামের বাড়িতে গেলাম। তিনি সেখানেই ছিলেন। স্বাস্থ্য তাঁর তখন ভাল নয়। দু'জনে পার্কে হাঁটছিলাম। যেভাবে তিনি চলছিলেন, কথা বলছিলেন, তাঁকে যেমন দেখাচ্ছিল, তাতে বোঝা যাচ্ছিল তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত। দীর্ঘ চার বছরের যুদ্ধে প্রতিটি পরাজয়, বিশেষত ১৯৪১-৪২-এর পরাজয়ের ব্যথা বুকে বহন করে সেদিন কী প্রচণ্ড পরিশ্রম যে তিনি করেছিলেন ! ঘুমোতেন অত্যন্ত কম। তাঁর আয়ুর ওপর, স্বাস্থ্যের ওপর এই প্রচণ্ড চাপের ছায়া পড়ে গিয়েছিল। পার্কে যখন আমরা পায়চারি করছি, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে স্ট্যালিন বলতে লাগলেন তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলোর কথা। প্রায় এক ঘন্টা আমরা কথা বললাম। ফেরার পথে আমি বললাম, 'কমরেড স্ট্যালিন, একটা কথা অনেক দিন ধরে বলব বলব ভাবছি, আপনার ছেলের কথা, তাঁর খবর কিছু পেলেন নাকি ?' স্ট্যালিন তখনই কিছু বললেন না। আমরা বেশ কিছুটা নীরবে হেঁটে গেলাম। তারপর অত্যন্ত ধীরে কোমল স্বরে স্ট্যালিন বললেন, 'ইয়াকভকে ওরা কিছুতেই মুক্তি দেবে না, ফ্যাসিস্টরা সবার আগে তাকে গুলি করে মারবে। আমরা যতটুকু জানি, অন্য যুদ্ধবন্দীদের থেকে ওরা তাকে আলাদা করে রেখেছে ; প্রচণ্ড চাপ দিচ্ছে, যাতে ইয়াকভ দেশদ্রোহিতা করতে বাধ্য হয়'। খানিক নীরব থেকে আবার বললেন, 'না, ভয়াবহ অত্যাচার সহ্য করে ইয়াকভ বরং মরবে, কিন্তু দেশদ্রোহিতা সে কিছুতেই করবে না।' ... চায়ের টেবিলে বসে বহুক্ষণ তিনি কথা বললেন না, খাবার ছুঁলেনও না। তারপর অনেকটা স্বগতোক্তির মতো অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'যুদ্ধ কী ভয়ানক, এই যুদ্ধ কত মানুষের প্রাণ কেড়ে নিল, কোন না কোন আপনজনকে হারায়নি এমন পরিবার আজ দেশে ক'টা আছে ? ... কমিউনিস্ট পার্টির দ্বারা উন্নত চেতনায় উদ্বুদ্ধ, যুদ্ধে পোড় খাওয়া সোভিয়েটের মানুষ বলেই এই বিরাট অগ্নিপরীক্ষায় তারা উত্তীর্ণ হতে পেরেছে।" এই ছিলেন স্ট্যালিন। এভাবেই দল, বিপ্লব, সমাজতন্ত্র এবং সর্বহারা শ্রেণীর ভাল-মন্দের সঙ্গে নিজের পরিবারের ভাল-মন্দ সমস্ত কিছু একাত্ম করে দিয়ে, কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি হয়েছিলেন মহান নেতা, কমরেড লেনিনের সুযোগ্য ছাত্র ও উত্তরসাধক।

স্ট্যালিনগ্রাদ যুদ্ধে বিজয়ের পর স্রোত উল্টো দিকে ফিরে গেল। আগে মনে

হচ্ছিল, জার্মানি সারা বিশ্বকে ধ্বংস করে দেবে। ১৯৩৯-এর ৩ জুলাই স্ট্যালিন যে বলেছিলেন, "ইতিহাসে কোন সেনাবাহিনীই অপরাজেয় নয়," তা সত্য প্রমাণিত হল। স্ট্যালিনগ্রাদ-বিজয়ের পরে অপরাজেয় জার্মান বাহিনীর পরাজয়টাই অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় মিত্রপক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতি কুখ্যাত মার্কিন জেনারেল ম্যাক আর্থারও স্বীকার করতে বাধ্য হন, "বর্তমানে যা দেখা যাচ্ছে তাতে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, পৃথিবীতে মানবসভ্যতার শেষ আশাভরসা হচ্ছে সোভিয়েট রাশিয়ার বীর লালফৌজ। আমার জীবনে অনেক যুদ্ধ আমি নিজে পরিচালনা করেছি, অনেক যুদ্ধ নিজে দেখেছি, তাছাড়া অতীতের অনেক বড় বড় যুদ্ধ নিয়ে যথেষ্ট বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণা করেছি। কিন্তু কোন যুদ্ধের ইতিহাসে আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি যে, এমন প্রচণ্ড অপ্রতিহত গতিসম্পন্ন কোন বাহিনীর সামনে কোন দেশের সেনাবাহিনী রুখে দাঁড়াতে পারে, এমন তীব্র আক্রমণের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ হেনে তাকে ভেঙে চুরমার করে দিতে পারে এবং তার গতির মোড় ঘুরিয়ে তাকে তার নিজের দেশমুখো ভীতসন্ত্রস্ত জনতার মত তাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাসে সোভিয়েট সেনার এই বীরত্বের এবং এই সংগ্রামের কোন তুলনা নেই, অন্তত আমার জানা নেই।" (সোভিয়েট বিরোধী চক্রান্ত, মাইকেল সেয়ার্স এবং অ্যালবার্ট ই কহন)। এই মহান সংগ্রামে সোভিয়েট সেনার দুর্জয় প্রতিরোধ এবং অসীম মনোবলের উৎস উন্নততর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, লেনিনের আদর্শ ও স্ট্যালিনের নেতৃত্ব। মরণপণ সংগ্রামে তাদের সঙ্কল্প-বাক্য ছিল — "দেশের জন্য, স্ট্যালিনের নামে সর্বস্ব" দিয়ে লড়াই।

১৯৪৪-এর গ্রীষ্মকালের প্রথমদিকে জার্মান বাহিনীকে তাড়িয়ে সোভিয়েট সীমান্তের বাইরে নিয়ে ফেলা হয়। কিন্তু তাতে তো যুদ্ধের শেষ হল না। জার্মান আক্রমণের দ্বাদশ দিনে ৩ জুলাই বেতার ভাষণে স্ট্যালিন স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছিলেন, "ফ্যাসিস্ট উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে সমগ্র জাতিকে জড়িত করে আমাদের এই যুদ্ধের লক্ষ্য কেবল আমাদের দেশের সামনে দেখা দেওয়া গভীর বিপদ দূর করা নয়। জার্মান ফ্যাসিবাদী জাঁতাকলে পিষ্ট সকল ইউরোপীয় জনগণকে সহায়তা করাও আমাদের লক্ষ্য।" ফলে, ফ্যাসিবাদী যাঁতাকলে পিষ্ট ইউরোপীয় জনগণকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সোভিয়েট ফৌজ এগিয়ে চলে। চূড়ান্ত লক্ষ্য, ফ্যাসিস্টদের প্রধান ঘাঁটি বার্লিন মুক্ত করা। তাছাড়া, আনা লুই স্ট্রং লিখেছেন, "জার্মান ব্যূহ ভেদ করা হয়ে গেলে, সোভিয়েটের অগ্রগামী সাঁজোয়া বাহিনী দ্রুত এগিয়ে চলল। মার্শাল ঝুকভের ট্যাঙ্কগুলো একদিনে সত্তর মাইল এগিয়ে গেল — সে একটা দেখার মত জিনিস! সৈন্যদের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে

রেলওয়ে কর্মীরা পূর্ব-পশ্চিম রেলওয়েগুলোর গেজ (দুটো রেললাইনের মধ্যেকার ফাঁক) বদলে দিতে লাগল। ফলে যুদ্ধের জোগান আসতে লাগল সরাসরি উরাল অঞ্চল থেকে, দু'হাজার মাইল দূর থেকে সরাসরি একেবারে রণাঙ্গনে। দুনিয়ার সামরিক বিশেষজ্ঞরা অবাক হয়ে গেলেন, কামানের গোলা আর পেট্রলের এই নিরবচ্ছিন্ন জোগান দেখে।

"যেদিক থেকে আক্রমণ জার্মানরা প্রত্যাশাই করেনি, ঠিক সেই দিক থেকে এগিয়ে, সোভিয়েট বাহিনীগুলির পরস্পরের কাছে ঠিক যতটুকু সাহায্যের দরকার সেটা পাওয়ার উপর নির্ভর করে, ঐ বড় বাহিনীগুলি কীভাবে শহরের পর শহরে জার্মানদের ঘিরে ফেলল, একজন অসামরিক লোক হয়েও আমি মানচিত্রের সাহায্যে সেটা বুঝতে গিয়ে তার অপূর্ব ছন্দ ধরতে পারলাম।..."

এমনিভাবে একটার পর একটা দেশকে দখলমুক্ত করতে করতে এগিয়ে যায় সোভিয়েট লালফৌজ। প্রতিটি ক্ষেত্রেই নাৎসিবাহিনীর সঙ্গে ভয়াবহ সংঘর্ষে লালফৌজের লক্ষ লক্ষ সৈনিককে প্রাণ দিতে হয়েছে (এ সংক্রান্ত তথ্য পূর্বেই দেওয়া হয়েছে)। জার্মান অধিকৃত দেশগুলির সাধারণ মানুষের কাছে সোভিয়েটের ফৌজ তখন স্বাধীনতা ও মুক্তির অগ্রদূত, বর্বর দাসত্বের শৃঙ্খল মোচনকারী মহান ত্রাণকর্তা।

ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর নরম্যান্ডি অবতরণ, প্রচার ও বাস্তব

১৯৪১-এর ২১ জুন সোভিয়েটে ঢুকেছিল নাৎসিবাহিনী; ১৯৪৪-এর গ্রীষ্মের প্রথম দিকে লালফৌজ নাৎসিবাহিনীকে বিতাড়িত করে সোভিয়েট সীমান্তের বাইরে ঠেলে দেয়। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী কিন্তু তখনও ইউরোপ ভূখণ্ডে কোথাও সৈন্য নামায়নি, প্রতিরোধ যুদ্ধ দূরের কথা। লালফৌজ তখন পোল্যান্ডের মধ্য দিয়ে নাৎসিদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। অন্য কারও সাহায্য ছাড়া লালফৌজই নাৎসি জার্মানির কবর খুঁড়ে চলেছে, সমগ্র ইউরোপকে তারাই মুক্ত করে ফেলবে। এই সম্ভাবনা ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে ঘোরতর বিপদ হিসাবে দেখা দেয়। কারণ, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতৃত্বে গোটা ইউরোপ মুক্ত হলে তা শুধু নাৎসিবাহিনীকেই বিতাড়িত করবে না, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার গোড়াতেও আঘাত হানবে। জনগণের মধ্যে ইতিমধ্যে সোভিয়েট সমাজতন্ত্র সম্পর্কে যে প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে তা উত্তাল তরঙ্গে পরিণত হয়ে ইউরোপকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। জার্মানির সাথে হাত মিলিয়ে সোভিয়েট সমাজতন্ত্র ধ্বংসের যে পরিকল্পনা সাম্রাজ্যবাদীরা করেছিল, তাও ধূলিসাৎ হয়ে

যাবে। এই বিপদে পড়েই ইতিপূর্বে সোভিয়েট সরকারের বহু আবেদনেও যেটা তারা করেনি, ১৯৪৪ সালে ৬ জুন সেটাই ঘটে, ইঙ্গ-মার্কিন সেনা ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে নামে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবার সাম্রাজ্যবাদীরা প্রচার করেছে, যেন তাদের হাতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ঘটেছিল ; সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট নয়, সাম্রাজ্যবাদীরাই ফ্যাসিস্ট জার্মানি ও জাপানকে পরাস্ত করার নায়ক এবং সেই মর্মে তারা হলিউডি সিনেমাও নির্মাণ করিয়েছে। এটা যে কতবড় মিথ্যাচার সেটা বোঝার জন্যই নরম্যান্ডি অভিযানের কিছু ইতিহাস জানা দরকার।

মেজর জেনারেল মাৎসুলেনকো (ইতিহাসের অধ্যাপক) এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, ''...নরম্যান্ডিতে অভিযানকারী ইঙ্গ-মার্কিন সেনার মোট সংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ ৭৫ হাজারেরও বেশি। ঐ সময় সেখানে এই বাহিনীর বিরুদ্ধে মোতায়েন ছিল বিগত লড়াইগুলোতে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত মাত্র ১৮টি জার্মান ডিভিশন। বাকি সব সৈন্য তখন সোভিয়েট লালফৌজের সঙ্গে যুদ্ধরত।'' শুধু তাই নয়, ''উত্তর ফ্রান্সে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সফল অবতরণে সহায়তা করেছিল ফরাসি স্বদেশপ্রেমিকদের (পার্টিজান) সক্রিয় কার্যকলাপ। এরা জার্মান দখলদারদের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম চালিয়েছিল। এমনকী মিত্র বাহিনীর অবতরণ-অঞ্চলেই সংগ্রামরত ফরাসি পার্টিজানরা ৪২টি শহর ও শত শত গ্রাম মুক্ত করেছিল। মার্কিন সেনাপতি স্বয়ং আইজেনহাওয়ারও ফরাসি পার্টিজানদের অবদান স্বীকার করতে বাধ্য হন। তিনি লেখেন, 'অভিযানের সময় সারা ফ্রান্সে এই শক্তিগুলি আমাদের অমূল্য সহায়তা প্রদান করেছে। ...তাদের বিপুল সহায়তা ব্যতিরেকে ...শত্রুকে ধ্বংস করতে আরও বেশি সময় এবং আরও বেশি প্রাণহানির প্রয়োজন হত।''

বহুগুণ বেশি সৈন্য ও অস্ত্রবল, সাথে ফরাসি পার্টিজানদের 'অমূল্য সহায়তা' — এতসব সত্ত্বেও ঐ ছোট্ট ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। মাৎসুলেনকো লিখেছেন, ''এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষকে হারাতে হয় ১ লক্ষ ২২ হাজার সেনা, যার মধ্যে ৪৯ হাজার ছিল ব্রিটিশ ও কানাডিয়ান এবং প্রায় ৭৩ হাজার মার্কিন।

বৃটেন আমেরিকা স্ট্যালিনের শরণাপন্ন

এরপর ছোটখাটো প্রতিরোধ ছাড়া বড় কোন লড়াই ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে আর লড়তে হয়নি। এবার বিজয়ী মিত্রবাহিনী প্যারিস হয়ে এগুতে থাকে জার্মানি

অভিমুখে। পথে কোন বাধা নেই। সারি সারি জার্মান ট্যাঙ্ক রাস্তায় দাঁড়িয়ে, কোনটাতেই একফোঁটা জ্বালানি তেল নেই, একটা গোলাও নেই। সমস্ত জার্মান সেনা তখন সোভিয়েট-বিরোধী রণাঙ্গনে। দীর্ঘপথ নির্বিবাদে এগিয়ে তারা ৬৩ ডিভিশনের বিপুল সেনা নিয়ে জার্মানির সীমান্তে আর্দেন ও আলসেসে হাজির হল। সীমান্তে মোতায়েন জার্মান বাহিনী তখন সৈন্য সংখ্যায়, অস্ত্র বলে, বিমান সংখ্যার দিক থেকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর তুলনায় অনেক দুর্বল।

এহেন দুর্বল শক্তি নিয়েই জার্মান বাহিনী ১৯৪৪-এর ১৬ ডিসেম্বর ভোরবেলা ঝাঁপিয়ে পড়ে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর উপর। মাৎসুলেনকো তাঁর 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ — সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লিখছেন, "আচমকা আঘাত ... ; সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় মার্কিন সৈন্যেরা ... ; শুরু হয় বিশৃঙ্খল পশ্চাদপসরণ, যা কোন কোন জায়গায় পরিণত হয় আতঙ্কিত পলায়নে। মার্কিন সাংবাদিক আর ইনগেরসল লেখেন, 'জার্মান ফৌজ পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গণে আমাদের প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করে ফেলে এবং ঐ বিদ্ধ স্থল দিয়ে বাঁধভাঙা জলের মত প্রবল বেগে হুড়মুড় করে ঢুকতে থাকে। আর ওদের হাত থেকে পশ্চিমাভিমুখী সমস্ত পথ দিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালাচ্ছিল আমেরিকানরা।' ...আর্দেনে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী হারায় ৭৬ হাজার ৮৯০ জন সেনা। ...উত্তর আলসেস-এ ৭ম মার্কিন বাহিনীকে ঘিরে ফেলার ও ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আর্দেনের দক্ষিণে জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর আক্রমণ-অভিযানের পরিকল্পনা হচ্ছিল ১ম ও ১৯৩তম বাহিনী দুটির শক্তিকে সম্মিলিত করে।"

মাৎসুলেনকো লিখছেন, "এই পাল্টা আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল — বৃহৎ ট্যাঙ্ক শক্তির সাহায্যে আচমকা এক প্রবল আঘাত হেনে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীগুলিকে বিধ্বস্ত করে দেওয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনকে ফ্যাসিস্ট জার্মানির পক্ষে সম্মানজনক পৃথক শান্তিচুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করা।" সোভিয়েট মার্শাল ঝুকভের ভাষায় "হিটলার তখনও পূর্ণ বিশ্বাস নিয়েই ছিলেন যে, পশ্চিমী এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে একটা চুক্তিতে তাঁরা পৌঁছতে পারবেন, যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে 'কমিউনিস্ট বিপদের' বিরুদ্ধে সম্মিলিত লড়াই চালাতে পারে।" ফলে, "১৯৪৫-এর জানুয়ারির প্রথম দিকেও পশ্চিম ইউরোপে মিত্রদের অবস্থা জটিলই থেকে যায়। উত্তর আলসেসে অবস্থিত ৭ম মার্কিন বাহিনীকেও নাৎসিদের কাছে মার খেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পিছু হটতে হয়। মার্কিন সেনাপতি আইজেনহাওয়ারের সমস্ত মজুত শক্তি ফুরিয়ে যায়।" তখন নিরুপায় মিত্রপক্ষ সোভিয়েটের শরণাপন্ন হয়।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এক জরুরি পত্রে স্ট্যালিনকে লেখেন, "পশ্চিম

রণাঙ্গণে অত্যন্ত তীব্র লড়াই চলছে এবং যেকোন মুহূর্তে সেনাপতিমণ্ডলীকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। আপনি নিজ অভিজ্ঞতা থেকে জানেন যে, ...শুরুতেই সামরিক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে যাওয়ার পর যখন এক অতি বিস্তৃত রণাঙ্গণ রক্ষা করতে হয়, তখন অবস্থা কত আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে আপনি কী করতে পারেন তা সংক্ষেপে জানতে জেনারেল আইজেনহাওয়ার সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন, এবং এটা জানা তাঁর খুব দরকার। জানুয়ারি মাসে ভিশ্চুলা রণাঙ্গণে অথবা অন্য কোন স্থানে আমরা জার্মান বিরোধী বৃহৎ রুশ আক্রমণ-অভিযান প্রত্যাশা করতে পারি কি? ...আমি বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি বলেই মনে করছি।" (রাশিয়া অ্যাট ওয়ার, আলেকজান্ডার ওয়ার্থ)। সোজা কথায়, ভিশ্চুলা বা এইরকম কোন জায়গায় জার্মান বাহিনীর উপর সোভিয়েট এমন আক্রমণ হানুক যাতে হিটলার ইঙ্গ-মার্কিন রণক্ষেত্র থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে সোভিয়েট রণাঙ্গনে চলে যেতে বাধ্য হয়; তাতে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ফ্যাসিস্ট বাহিনীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। স্ট্যালিন শীঘ্র ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন এবং সোভিয়েট ফৌজের অভিযান আরম্ভের সময়টি জানুয়ারির দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রথমার্ধের দিকে এগিয়ে নিয়ে আসেন। ১২ জানুয়ারি বাল্টিক সাগর থেকে কার্পেথিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক অঞ্চল জুড়ে সোভিয়েট লালফৌজ আক্রমণ-অভিযান চালায়। এর ফলে, জার্মান বাহিনী পশ্চিমে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ-অভিযানের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। পাঁচদিন পর চার্চিল তারবার্তায় স্ট্যালিনকে 'হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে' ধন্যবাদ জানান এবং 'পূর্ব ফ্রন্টে হিটলারবিরোধী ব্যাপক অভিযানের জন্য' অভিনন্দিত করেন। (সূত্র ঃ ঐ)। পরে ফেব্রুয়ারি মাসে স্ট্যালিন এক বিবৃতিতে বলেন, রুশ আক্রমণ নিঃসন্দেহে পশ্চিম ফ্রন্টে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই ঘটনার পর, বিশেষ করে মার্চ মাসের পর আর একটি ক্ষেত্রেও জার্মান বাহিনীর সঙ্গে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে কোন যুদ্ধ করতে হয়নি। সবটাই লড়েছে সোভিয়েট লালফৌজ। ১৯৪৫-এর ২৭ মার্চ ২১তম আর্মি গ্রুপের সঙ্গে রয়টার-এর কথাবার্তার সময় ক্যাম্পবেল ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী সম্পর্কে রিপোর্ট করেছেন যে, কোনরকম জার্মান প্রতিরোধ ছাড়াই তারা জার্মান-রাজধানীর দিকে এগুচ্ছে। ১৯৪৫-এর এপ্রিলের মাঝামাঝি মার্কিন বেতার ধারা-ভাষ্যকার জন গ্রোভার বলেন যে, বাস্তবে পশ্চিম রণাঙ্গণের আর কোন অস্তিত্বই নেই, সেখানে কোন লড়াই হচ্ছে না। সমস্ত লড়াইটা হচ্ছে পূর্ব ফ্রন্টে — সোভিয়েট রণাঙ্গনে।

সোভিয়েটের অগ্রাভিযান ঠেকাতে ইঙ্গ-মার্কিন অপকর্ম

'রিয়া নোভস্তি' পত্রিকায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর এক গবেষক ডঃ ভ্যালেন্টাইন এম ফালিন এক ইন্টারভিউতে (দি স্টেটসম্যান, ৪-৫ মে '০৫) জানিয়েছেন, সোভিয়েট ফৌজ সোভিয়েট মুক্ত করার পরেও দেশে দেশে নাৎসিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে লক্ষ লক্ষ সোভিয়েট সৈনিকের প্রাণ বলি দিতে গেল কেন, বিশেষত বার্লিন দখলে তারা এমন মরিয়া হয়ে উঠল কোন্ যুক্তিতে — আমি বহুদিন যাবৎ এর সঠিক উত্তর জানতাম না; পশ্চিমী সংবাদপত্র ও বিশেষজ্ঞরা বলতেন — এসব হচ্ছে স্ট্যালিন ও ঝুকভের গোঁয়ার্তুমি। কিন্তু গত ৫-৬ বছর আগে প্রকাশিত বৃটিশদের নিজস্ব ডকুমেন্ট পড়াশুনা করে এবং ৫০-এর দশকে প্রাপ্ত তথ্যগুলির তুলনা করতে গিয়ে ধাঁধার বহু জবাবই আমার কাছে পরিষ্কার ছবির মত ফুটে উঠেছে। দেখতে পেয়েছি, সেই ১৯৪৫-এ সোভিয়েটের বিরুদ্ধে বৃটিশ-মার্কিন ষড়যন্ত্রের গোপন ছক। দেখতে পেয়েছি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাধিয়ে সোভিয়েট ধ্বংসের বৃটিশ প্রস্তুতি। মিত্রজোটের অংশীদার হয়েও যুদ্ধে সোভিয়েটকে তারা কেন সহযোগিতা করেনি এবং পূর্বকৃত সমস্ত চুক্তি লঙঘন করে সোভিয়েটের এক্তিয়ারে পড়া পোলেইস্তি তৈলক্ষেত্রে, ড্রেসডেন, ওরিয়েনবুর্গ ইত্যাদিকে কেন তারা ধ্বংস করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল — তাও আমার সামনে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে এই সত্যও পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, নাৎসিবাহিনী কেন ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে কোন বাধা না দিয়ে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং এই বাহিনীকে দ্রুত বার্লিনে ঢুকে পড়ার জন্য কেন এমন স্বাগত জানায়। অথচ সোভিয়েট ফৌজের বিরুদ্ধে নাৎসিরা ভয়ঙ্কর হিংস্র লড়াই মারফৎ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেন প্রতিরোধ চালিয়ে গেল।

ফালিন বলেছেন, ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারিতে ক্রিমিয়ায় ত্রিশক্তির (সোভিয়েট, বৃটেন ও আমেরিকা) ইয়াল্টা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; শেষ হয় ১১ ফেব্রুয়ারি। তিন রাষ্ট্রই রাজী হয় যে, তাদের বিমানবাহিনী সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত এলাকার মধ্যে লড়াই চালাবে, কেউই এর অন্যথা করবে না। কিন্তু পরদিনই রাতে ইঙ্গ-মার্কিন বিমানবাহিনী সোভিয়েট যুদ্ধ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত ড্রেসডেনে এবং পরে শ্লোভাকিয়ার সর্বাধিক উৎপাদনশীল অঞ্চলে ব্যাপক বোমাবাজি করে সব ধ্বংস করে দেয় যাতে সোভিয়েট এসব এলাকায় ঢুকে ভাল কিছু না পায়। লালফৌজের দুরন্ত গতি আটকাতে তারা ড্রেসডেনে এলবে নদীর উপর নির্মিত সমস্ত সেতুও ধ্বংস করে দেয়; সেখানকার ২৪ হাজার নিরীহ সাধারণ মানুষকেও হত্যা করে। এর আগে ১৯৪৪ সালে রোমানিয়ার পোলেইস্তি তৈলক্ষেত্র

লালফৌজের দখলে আসার মুখেই বিমান থেকে বোমা মেরে ধ্বংস করে দিয়েছিল তারা।

ফালিন বলেছেন, এতদ্‌সত্ত্বেও সোভিয়েট কিন্তু ইয়াল্টা চুক্তির এতটুকু লঙঘন করেনি। একটা ঘটনাও তিনি এ প্রসঙ্গে তুলে ধরেছেন। স্ট্যালিন বিদেশমন্ত্রকের ইউরোপীয়ান বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আন্দ্রেই স্মিরনভকে ডেকে পাঠিয়েছেন সোভিয়েট নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলির বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের ব্যাপারে আলোচনার জন্য। স্মিরনভ এসে রিপোর্ট করেন যে, অস্ট্রিয়াতে সোভিয়েট সেনারা শত্রুদের তাড়িয়ে নিয়ে ইয়াল্টা কনফারেন্সে নির্দ্ধারিত সীমা অতিক্রম করেও অনেক দূর ঢুকে গেছে এবং তাঁর প্রস্তাব — এই নতুন পজিশনেই আমাদের থাকা উচিৎ, দেখা যাক, একইরকম অবস্থায় আমেরিকা কী করে! তৎক্ষণাৎ স্ট্যালিন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'আপনি ভুল করছেন। মিত্রপক্ষকে এখনি টেলিগ্রাম পাঠান।' তারপর তিনি নিজেই লেখার জন্য বলে চলেন, 'সোভিয়েট বাহিনী হেরমাখট ইউনিটকে তাড়াতে তাড়াতে আমাদের পুর্ব নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করে চলে গিয়েছে। আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে, সামরিক অভিযান শেষ করেই সোভিয়েট বাহিনী চুক্তি নির্দিষ্ট এলাকাতেই ফিরে আসবে।' চুক্তির প্রতি সোভিয়েট কেমন নীতিনিষ্ঠ ছিল — এই ঘটনা তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ছক প্রতিরোধ করে সোভিয়েট

মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মারা যান ১৯৪৫-এর ১২ এপ্রিল, সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনের ঠিক আগেই। নতুন প্রেসিডেন্ট হন হ্যারি ট্রুম্যান। বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সঙ্গে তাঁর বেশ ভালই ঘনিষ্ঠতা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হিংস্র বীভৎস চেহারাটা এবার তার নখ দাঁত বের করে। ফালিন লিখেছেন, বৃটিশ নথিপত্র থেকে পরিষ্কার যে, ১৯৪৫-এর মার্চ থেকে অর্থাৎ আর্দেনসে জার্মান বাহিনীর হাতে মার খাওয়া এবং সোভিয়েট ফৌজের সহায়তায় বিপন্মুক্ত হওয়ার পর থেকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে আর কোন যুদ্ধ করতে হয়নি। জার্মান সেনারা সোভিয়েটের লাল ফৌজের বিরুদ্ধে প্রতিটি ক্ষেত্রে হিংস্র আক্রমণ চালিয়ে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুললেও ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ক্ষেত্রে তাদের আচরণ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধ না গড়ে তুলেই ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে থাকে, নয়ত পূর্বদিকে পিছিয়ে আসে। জার্মান কৌশল ছিল, সোভিয়েট-জার্মান রণক্ষেত্রের পুরো এলাকায় তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোল এবং লালফৌজকে আটকে রাখ যতক্ষণ না 'প্রকৃত ক্ষমতা সম্পন্ন (virtual)'

পশ্চিম ও 'প্রকৃত (real)' পূর্ব ফ্রন্টের মধ্যে মিলন ঘটে (অর্থাৎ, পশ্চিমের ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে পূর্বের জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর মিলন ঘটে) এবং ইউরোপের ঘাড়ে চেপে বসা 'সোভিয়েট আতঙ্ক' হঠানোর দায়িত্ব জার্মানদের হাত থেকে যতক্ষণ না ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী গ্রহণ করে।

ফালিন আরও লিখেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এই বলে এবার বোঝাতে থাকেন যে, তেহরান বা ইয়াল্টা কনফারেন্সে যেসব চুক্তি হয়েছে, সেসব মেনে চলবার আর কোন দরকার নেই। তাঁর মতে, এখন নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, ফলে নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। পরিস্থিতি দাবি করছে যে, পূর্ব চুক্তি নির্ধারিত সীমানা ছাড়িয়ে আরও পূর্বদিকে আমাদের ঢুকে যেতে হবে। ইতিপূর্বে পটস্‌ডাম্ কনফারেন্সে বা অন্যান্য কনফারেন্সে সোভিয়েট জনগণের যুদ্ধজয়ের যে কৃতিত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল, চার্চিল তার বিরুদ্ধেও সরব হতে শুরু করেন। শুধু তাই নয়, ১৯৪৫-এর এপ্রিলের শুরুতে জরুরি ভিত্তিতে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আচমকা যুদ্ধের — 'অপারেশন আনথিঙ্কেব্‌ল'-এর পরিকল্পনা তৈরির আদেশ জারি করেন। নতুন যুদ্ধ শুরু করার তারিখও তিনি স্থির করে ফেলেন — ১ জুলাই, ১৯৪৫। আমেরিকান, কানাডিয়ান, পোলিশ এবং ১০-১২ ডিভিশন জার্মান সৈন্য এই সোভিয়েটবিরোধী অভিযানে অংশ নেবে। শ্লেজভিগ হলস্টাইন এবং দক্ষিণ ডেনমার্কের জাটল্যান্ডে আত্মসমর্পণ করা এই জার্মান সৈন্যবাহিনীকে ভেঙে না দিয়ে তাদের সযত্নে রাখা হয়েছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা মাথায় রেখে। চার্চিলের যুক্তি — এখন সোভিয়েটের সহায়সম্পদ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে, মূল রণক্ষেত্র থেকে তাদের পশ্চাদ্‌ভূমির যোগাযোগ অনেক দূর পিছনে, ফৌজ ক্লান্ত, এবং সমরাস্ত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত; এই সেই সুবর্ণ সুযোগ যখন আমরা পশ্চিমীরা সোভিয়েটকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারি এবং দাবি করতে পারি যে, সোভিয়েট হয় মিত্রশক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করুক, নয়তো নতুন যুদ্ধের ভয়াবহতার মোকাবিলা করুক।

ফালিন আরও বলেছেন, পশ্চিমে এমন অনেক রাজনৈতিক ও সামরিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, ১৯৪৫-এর বসন্তে প্রায় কোন যুদ্ধ না করেই সহজ ইউরোপ বিজয়ের ফলে তাদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। এঁদের একজন হলেন মার্কিন জেনারেল জর্জ প্যাটন। তিনি উন্মত্তের মত দাবি করেন, মার্কিন ফৌজের অভিযানকে অব্যাহত রেখে এলবে থেকে পোল্যান্ড ও উক্রাইনের ভিতর দিয়ে স্ট্যালিনগ্রাদে গিয়ে যুদ্ধ শেষ করতে হবে; যেখানে হিটলার পরাস্ত হয়েছে সেখানেই ওড়াতে হবে মার্কিন বিজয় পতাকা। রুশ জনগণ সম্পর্কে এই জেনারেলের ছিল তীব্র ঘৃণা; বলতেন — রুশরা 'চেঙ্গিজ খানের বাচ্চা।'

ফালিনের গবেষণায় আরও প্রকাশ পেয়েছে যে, এই প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের রাজি হওয়া সম্ভব ছিল না এবং তিনি সেই কারণগুলিও চার্চিলকে জানান — (১) মার্কিন জনগণ এই কাজটিকে ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা মনে করবে এবং সেটা তারা মেনে নেবে না, তাদের মানসিকতা এখন সেই অবস্থায় নেই। (২) আমেরিকা তখনও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, সেখান থেকে সেনা সরিয়ে এনে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে জাপ-বিরোধী রণক্ষেত্রে আমেরিকা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তাহলে জাপানের হাতে ১০ থেকে ২০ লক্ষ মার্কিন সেনার জীবন যাবে। এতটা ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করার মত অবস্থায় আমেরিকা নেই। এবং (৩) সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করা যত সহজ, বিজয় অর্জন তত সহজ হবে না। এমন মারাত্মক ঝুঁকি নেওয়া অসম্ভব।

আমেরিকার এই তৃতীয় সিদ্ধান্তের পিছনে আর্দেন-আলসাস লড়াইয়ের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা কাজ করেছে। মাত্র কয়েক ডিভিশন জার্মান সেনার মহড়া নিতে পারেনি ইঙ্গ-মার্কিন প্রায় ১০০ ডিভিশন সৈন্য। জার্মান সৈন্য এমনই উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সেই লক্ষ লক্ষ জার্মান সেনা সোভিয়েটে ঢুকে পরাজয় বরণ করেছে। এই অবস্থায় ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী তো সোভিয়েটের কাছে অতি তুচ্ছ। ফলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঠিকই বুঝেছেন, যুদ্ধ শুরু করা সহজ, কিন্তু জয়লাভ সুদূরপরাহত। অতএব সেই ঝুঁকি নেওয়া যাবে না।

ফালিন আরও লিখেছেন, ১৯৪৫-এর এপ্রিলে সোভিয়েট ফৌজ যখন ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে করতে জার্মানিতে এসে পড়ে, তখন ইঙ্গ-মার্কিন বিমানবাহিনী চুক্তি-নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করেই ঢুকে পড়ে এবং পটাস্‌ডাম ও ওরিয়েনবুর্গ-এ বোমা বর্ষণ করে সবকিছু একেবারে ধূলোয় মিশিয়ে দেয়। ওরিয়েনবুর্গে ছিল জার্মানির বিখ্যাত পরমাণু গবেষণাগার; সেটি যাতে সোভিয়েট বাহিনীর হাতে গিয়ে না পড়ে তার জন্য সেই গবেষণাগার, তার বৈজ্ঞানিক বাহিনী, কর্মচারী বাহিনী ও যন্ত্রপাতিসহ সকল আবিষ্কার — সব ধ্বংস করে দেয়। তারা এর দ্বারা সোভিয়েটের অপ্রতিহত বিজয় অভিযানকে পরোক্ষে হুঁশিয়ারি দেয় যে, 'দেখ, আমাদের ইঙ্গ-মার্কিন আকাশবাহিনী কেমন দুর্ধর্ষ ক্ষমতার অধিকারী।' ফলে সোভিয়েটের সামনে তখন যেকোন আত্মত্যাগের বিনিময়ে বার্লিন দখল আরও জরুরী হয়ে দেখা দেয়। ইঙ্গ-মার্কিন হুমকির পাল্টা হিসেবে তারা বোঝাতে চাইল যে, যুদ্ধের ফলাফল আকাশ বা সমুদ্রে নির্ধারিত হয় না, নির্ধারিত হয় স্থলযুদ্ধে; সেই যুদ্ধে সোভিয়েট লালফৌজ সবার থেকে অনেক এগিয়ে। অন্যদিকে, জার্মান নাৎসিবাহিনী তখন সব শক্তি দিয়ে সোভিয়েট ফৌজের গতিরোধ করার মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, চেষ্টা করছে — অন্তত

লালফৌজের গতিটাকে স্তিমিত করে রাখতে। তাদের পরিকল্পনা — ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী পশ্চিমদিকে দ্রুত জার্মানিতে ঢুকে পড়ুক এবং আগেভাগেই বার্লিনের দখল নিয়ে নিক। তাহলে তাদের সঙ্গে জার্মান বাহিনী মিলিতভাবে সোভিয়েট ফৌজের বিরুদ্ধে আবার একটা সর্বাত্মক লড়াই চালাবে। অর্থাৎ সেই বৃটিশ পরিকল্পনা — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা — চার্চিলের 'অপারেশন আনথিঙ্কেব্‌ল।' সাম্রাজ্যবাদীদের চিন্তায় কেমন অজানিত ঐক্য। বৃটিশ ও জার্মান সাম্রাজ্যবাদী নায়করা বিপরীত শিবিরে থাকলেও একই সঙ্গে একই ভাবনা ভাবছে।

ফলে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী বার্লিনে পৌঁছানোর আগেই লালফৌজকে বার্লিন দখল করে ফেলতে হবে। ২৭ এপ্রিলের মধ্যেই লালফৌজ পৌঁছে যায় বার্লিনে। মার্শাল ঝুকভ ও মার্শাল কোনিয়েভ দেড় শতাধিক সেনাপতি সহ বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে বার্লিনে প্রবেশ করেন। ঝুকভের সৈন্যরা উত্তর-পূর্ব দিক ধরে এবং কোনিয়েভের সৈন্যরা দক্ষিণ দিক দিয়ে বার্লিনকে চেপে ধরে। শহরের পূর্বাংশ চলে যায় লালফৌজের দখলে; বার্লিনের প্রধান সড়ক উন্টের ফেন লিনডেনও লালফৌজ দখল করে নেয়। বিরাট রক্তক্ষয়ী প্রতিরোধ সত্ত্বেও বার্লিনের এক-তৃতীয়াংশ হিটলারের হাতছাড়া। বৃটেন-মার্কিন-ফরাসি বাহিনী তখনও অনেক দূরে। তবু, ২৯ এপ্রিল জার্মানির পক্ষ থেকে নাৎসি গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা হিমলার নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠায় সোভিয়েটের কাছে নয়, বৃটিশ ও মার্কিন সরকারের কাছে। ফ্যাসিস্ট জার্মান সরকারের শেষ মুহূর্তেও একটা অন্তিম চেষ্টা — বৃটেন-মার্কিন-ফরাসি বাহিনীর সহায়তা নিয়ে যদি সোভিয়েটের বিরুদ্ধে লড়াই চালানো যায়। কিন্তু তখন কোনও উপায় নেই, যুদ্ধ সোভিয়েটের নিয়ন্ত্রণে; সোভিয়েটকে বাদ দিয়ে কোন যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে না। বৃটেন-আমেরিকা জানালো — শুধু আমাদের কাছে নয়, সোভিয়েটের কাছেও আত্মসমর্পণ প্রস্তাব পেশ করতে হবে (সূত্র ঃ রুশ-জার্মান যুদ্ধ ঃ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়)।

এদিকে হিটলারের দক্ষিণ হস্ত মার্শাল গোয়েরিং অকস্মাৎ পদত্যাগ করে বেপাত্তা, জেনারেল ডিয়েটমার ও ফন প্যাপেন বন্দী; ইটালির মুসোলিনি ও তাঁর প্রধান সেনাপতি জেনারেল গ্রাৎসিয়ানি ধরা পড়েছেন। ৩০ এপ্রিল মন্ত্রীভবনের ভূগর্ভস্থ গুপ্তকক্ষে আত্মহত্যা করলেন হিটলার ও তাঁর প্রচারসচিব গোয়েবলস। পরে হিমলারও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

সোভিয়েট সাঁজোয়া বাহিনী বার্লিনের বুক চিরে ছুটে চলে রাইখস্ট্যাগ অভিমুখে। তীব্র নাৎসি প্রতিরোধ ভেঙে লালফৌজ শেষ পর্যন্ত ২ মে বিকাল

৩টায় জার্মান পার্লামেন্ট রাইখস্টাগ গৃহের চূড়ায় উড়িয়ে দেয় লালপতাকা — ফ্যাসিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিজয়ের পতাকা। ফ্যাসিবাদী জার্মানির পতন ঘটে শুধু তাই নয়, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুপ্ত পরিকল্পনাও মুখ থুবড়ে পড়ে লালফৌজের বীরত্বের কাছে, মহান স্ট্যালিনের যুদ্ধ পরিকল্পনার কাছে। এই যুদ্ধ পরিকল্পনা কেবল বুদ্ধির কৌশল নয়, এর বনিয়াদ হল সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার প্রতি দায়বদ্ধতা। এ এমন এক যুদ্ধ-কৌশল যা নিতে পারে সমাজতন্ত্র, যে ব্যবস্থায় জনগণ রাষ্ট্রকে শোষণের হাতিয়ার বলে মনে করে না, রাষ্ট্রকে তারা নিজেদের বিকাশের হাতিয়ার হিসাবে জ্ঞান করে। এ যুদ্ধকৌশল নিতে পারেন তেমন একজন নেতা যিনি নিজে বিপ্লবের প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি; শ্রমিক, কৃষক দেশের সকল জনগণ, সেনা ও সেনাপতি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ; যাঁর নির্দেশে দেশের বিবেক প্রতিফলিত হয়। ৮ মে জার্মান সমরনায়করা বার্লিনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই সোভিয়েট, আমেরিকা ও বৃটেনের সেনাধ্যক্ষদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে।

কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর হাতে গেস্টাপো বাহিনী এবং নাৎসি বাহিনীর যে সব বড় বড় অফিসার আত্মসমর্পণ করে, তারা গেল কোথায়? পরবর্তীকালে প্রকাশ পেয়েছে, তাদের অধিকাংশই আশ্রয় লাভ করে আমেরিকায়। তাদের অনেকের মৃত্যুসংবাদও প্রকাশিত হয়। কিন্তু এটা যে বিশ্ববাসীর চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য — তা ফাঁস হয়ে যায়, যখন দ্বিতীয়বার তাদের মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হয়। এদের নাম বদলে দিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা নিজেদের গোয়েন্দা বাহিনী ও সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেয় এবং দেশে দেশে মার্কিন হানাদারি চালানোর ক্ষেত্রে তাদের ব্যবহার করে। অর্থাৎ আমেরিকার জার্মান-ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা আসলে নিজেদের ফ্যাসিবাদী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই।

জুলাই মাসে বার্লিনে বিজয় উৎসব উপলক্ষে 'ভিক্টরি প্যারেডে' অংশ নেওয়ার কথা ছিল তিন বিজয়ী রাষ্ট্রের প্রধান সেনাপতিদের। মার্কিন সেনানায়ক আইজেনহাওয়ার এবং বৃটিশ সেনানায়ক মন্টগোমারি অক্ষমতার জ্বালায় সেই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে রাজি হননি। রুশ সমর-নায়ক ঝুকভ একাই সেই প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ করেন।

সোভিয়েট লালফৌজই জাপানকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করে

নাৎসি জার্মানি পরাস্ত ও পর্যুদস্ত। কিন্তু জার্মানির সহযোগী জাপ-সাম্রাজ্যবাদ

তখনও এশিয়ায় সক্রিয়। পশ্চিমের ইতিহাস গ্রন্থগুলিতে বলা হয়েছে এবং অনেকে মনেও করেন যে, ১৯৪৫-এর ৬ এবং ৯ আগস্ট জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকি শহরে আমেরিকা অ্যাটম বোমা ফেলে যে বিপুল ধ্বংস ঘটায় তাতেই জাপান আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। প্রকৃত ইতিহাস তা নয়। অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণে জাপানের দুটি শহর ধ্বংস হয় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত ও বিকলাঙ্গ হয়ে যায়, একথা ঠিক। কিন্তু তার দ্বারা আমেরিকা জাপানকে নতজানু করাতে পারেনি। ইংরেজ অধ্যাপক পি এম এস ব্ল্যাকেট বলেছেন, এই বোমা বিস্ফোরণ 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্বের শেষ সামরিক কাজ নয়, এটি হচ্ছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা রাজনৈতিক যুদ্ধের প্রথম কাজ।' (মিলিটারি অ্যান্ড পলিটিক্যাল কনসিকোয়েন্স অফ অ্যাটমিক এনার্জি)। ২৬ জুলাই আমেরিকা ও বৃটেনের দেওয়া নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের প্রস্তাব জাপান প্রত্যাখান করে। এরপর অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণ। জাপান তাতেও পরাজয় স্বীকার করেনি। আমেরিকা তখন জাপানের মূল ভূখণ্ডের দ্বীপগুলিতে পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে সেনা নামানোর পরিকল্পনা করে।

সবচেয়ে শক্তিশালী কুয়ান্টুংবাহিনী তখনও চীনসহ অধিকৃত মাঞ্চুরিয়ায় কেন্দ্রীভূত ও সক্রিয়। এই অবস্থায় ৯ আগস্ট সোভিয়েট লালফৌজ কুয়ান্টুংবাহিনীর উপর আক্রমণ হানে। এরই পরিণতিতে অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণের প্রায় ১ মাস পর ২ সেপ্টেম্বর জাপান আত্মসমর্পণ করে। জাপানকে পরাস্ত করতে নিয়ামক ভূমিকা পালন করে মার্কিন অ্যাটম বোমা নয়, সোভিয়েট লালফৌজ। চীনে মার্কিন বায়ুসেনার অধিনায়ক জেনারেল কে. চেন্নোট 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্'কে (১৫-৮-৪৫) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রবেশ ছিল এক নিয়ামক বিষয় যা প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায় যুদ্ধের সমাপ্তিকে ত্বরান্বিত করেছিল। এমনকী পারমাণবিক বোমার ব্যবহার না করলেও ঠিক সেটাই ঘটত। জাপ-বাহিনীর বিরুদ্ধে লালফৌজ যে চূড়ান্ত আঘাত হানে, সেটাই জাপানকে নতজানু করে দেয়।" এর ফলে বিলুপ্ত হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ উৎসস্থল। এই অনিবার্য পরিণতিকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, জাপানে বোমা মেরে আটকাতে চেয়েছিল, যাতে এশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রভাব ছড়িয়ে না পড়ে, কিন্ত পারেনি।

লালফৌজ উত্তর-পূর্ব চীনকে মুক্ত করে এবং তার দ্বারা চীনা জনগণকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে ফেলবার ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিনটাঙের পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। মঙ্গোলীয় সেনাবাহিনী, মহান মাও সে তুঙ-এর চীনা গণমুক্তি ফৌজ এবং কোরিয় পার্টিজানদের সঙ্গে মিলে

সোভিয়েট লালফৌজ জাপানের কবল থেকে মাঞ্চুরিয়াকে মুক্ত করে। অর্থনৈতিক দিক থেকে চীনের সবচেয়ে বিকশিত এই অঞ্চলটি পরিণত হয় চীনের বিপ্লবী শক্তির নতুন রাজনৈতিক কেন্দ্রে। মাঞ্চুরিয়ায় অবস্থানরত চীনা বিপ্লবী ফৌজের হাতে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ তুলে দেয় সোভিয়েট লালফৌজ। এর দ্বারা চীনা গণমুক্তিবাহিনী তার ফৌজগুলিকে পুনর্সজ্জিত করে। ১৯৪৭-৪৮ সালে মাঞ্চুরিয়া থেকে মাও-এর গণমুক্তি ফৌজ কুওমিনটাঙ বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম বৃহৎ বিজয় অর্জন করে। মাও বলেছিলেন, "হানাদারদের বিতাড়িত করতে লালফৌজ চীনা জনগণকে সাহায্য করতে এসেছিল। চীনের ইতিহাসে এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা" ('সমগ্র জীবনের সাধনা' — এ. ভাসিলেভ্স্কি)। লালফৌজ কোরিয় জনগণকেও জাপ-শাসন থেকে মুক্ত করে। জাপ হানাদারির বিরুদ্ধে সোভিয়েট লালফৌজের এই বিজয় ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনে সাহায্য করে ; ইউরোপে এবং তারপর এশিয়ায় সোভিয়েট বিজয় ল্যাটিন আমেরিকা ও আরব দেশগুলির ঔপনিবেশকতাবিরোধী আন্দোলনের গতিবৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঐতিহাসিক বিজয়ের জন্য বিশ্ববাসী অভিনন্দিত করেছে সোভিয়েট লালফৌজ ও মহান নেতা স্ট্যালিনকে। লালফৌজ বলেছে, আমরা লড়েছি একথা সত্য; কিন্তু এই জয়ের আসল কারিগর কমরেড স্ট্যালিন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিশেষ প্রকৃতি অনুযায়ী সমর-বিজ্ঞানকে বিশেষরূপে ঢেলে সাজিয়েছিলেন তিনি। মার্শাল ঝুকভ লিখেছেন, "সমর বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্ট্যালিনকে বহু বিষয়ের মৌলিক প্রবর্তক বলা যায়।" মার্শাল কে ভরশিলভ লিখেছেন, 'সমরবিজ্ঞানকে যথার্থই আমরা 'স্ট্যালিনীয় সমর-বিজ্ঞান' বলে অভিহিত করেছি। ... সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে এই সমরবিজ্ঞান বিকশিত ও শক্তিশালী হয়েছে।"

বিশ্ব যখন স্ট্যালিন বন্দনায় মুখর তখন স্ট্যালিন কিন্তু যুদ্ধজয়ের পুরো কৃতিত্ব দিয়েছেন সোভিয়েট জনগণকে। ১৯৪৫-এর ২৪ মে সোভিয়েট কমান্ডারদের এক সভায় তিনি বলেন, ১৯৪১-৪২ সালে যখন আমাদের সেনাবাহিনী পিছু হটছিল, যখন ইউক্রেন, বেলারুশিয়া, মোলডাভিয়া, লেনিনগ্রাদ অঞ্চল, বাল্টিক অঞ্চল, কারেল-ফিনিস রিপাবলিকের গ্রাম ও শহরগুলি শত্রুর হাতে ছেড়ে না দিয়ে আমাদের কোন উপায় ছিল না, সেদিন সোভিয়েট জনগণ না হয়ে আর কেউ হলে তাদের সরকারকে তারা বলতে পারত — আমরা যা চাই তা তোমরা দিতে পারনি; তোমরা গদি ছেড়ে দাও, আমরা সেখানে অন্য

সরকার বসাব, যে সরকার জার্মানির সঙ্গে বোঝাপড়া করে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে, আমাদের জন্য এনে দেবে নিরুপদ্রব জীবন। কিন্তু রাশিয়ার মানুষ তা বলেনি। কারণ, সোভিয়েট সরকারের নীতি যে অভ্রান্ত — সে বিশ্বাস তাদের ছিল। তাই জার্মানির পরাজয় নিশ্চিত করতে তারা এগিয়ে এসেছিল। সোভিয়েট সরকারের উপর রাশিয়ার জনগণের অবিচল আস্থাই হল সেই অমোঘ শক্তি যা মানবসভ্যতার শত্রু ফ্যাসিবাদের সামরিক পরাজয়কে সুনিশ্চিত করেছে।